১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৫ বর্ষ | ২১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১ জৈষ্ঠ্য, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ৪ রজব, ১৪৩৪ হিজরি | ১৫ হিজরত, ১৩৯২ হি. শা. | ১৫ মে, ২০১৩ ঈসাব্দ

আবারও সত্যের সন্ধানে

৩০শে মে থেকে ২রা জুন

টানা ৪ দিন ব্যাপী

টেলিফোন ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০১০

ফ্যাক্স ঃ ০০-৪৪-২০৮-৬৮৭-৮০৩৭

ই-মেইল ঃ sslive@mta.com

সম্প্রতি নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান খলীফা যুক্তরাষ্ট্র সফরে গেলে সেখানকার আহমদী সদস্যরা তাঁকে লালগালিচা সম্বর্ধনা জানান

(মসজিদ পরিচিতি: মসজিদ 'বাইতুর রহমান', চিনো, লসএঞ্জেল্‌স্)

বিস্তারিত আগামী সংখ্যায়-

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

veronica tours & travels

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
ceo

Travel Agent & Tour Operator

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier),Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

New Vol. No. 75 | 21th Issue

The Ahmadi

Fortnightly

15th May, 2013 Tk. 18.00

Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১

নীচ তলা

রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২

ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,

০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার

অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)

(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)

ধানমন্ডি, ঢাকা।

ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"

মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta

CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Muhammad Nurul Islam Mithu** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mwPcÎ

১৫ মে, ২০১৩

চির প্রবহমান কল্যানধারা ইসলামে আহমদীয়া খেলাফত

সমগ্র বিশ্ব আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখিন, কোথাও যেন আলোর কোন দিশা দেখা যাচ্ছে না, সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা আর নৈরাজ্য বিরাজ করছে। এই ক্রান্তিকালে সারা বিশ্বে কেবল একটিই ঐশী জামা'ত রয়েছে যারা পথহারাকে সঠিক পথের সন্ধান দিচ্ছে আর শান্তির ধর্ম ইসলামের পতাকাতলে আশ্রয় নেয়ার আহ্বান করছে। মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় মহান খোদা তাআলার কৃপায় প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে পুণরায় ইসলামে নব জাগরণের সূচনা হয়েছে। তাঁর ওফাত লাভের পর '*খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত*'-এর ধারায় ১৯০৮ সালের ২৭ মে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খেলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই খেলাফতেরই একশত তিন বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে আগামী ২৭ মে তারিখে, ***আলহামদুলিল্লাহ।*** আল্লাহ্ তাআলার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশার্থে সারা বিশ্বজুড়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে খেলাফত প্রতিষ্ঠার এই দিনটি উদযাপন করে থাকে।

নবুওয়াতের পর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত কুদ্‌রতে সানীয়া–দ্বিতীয় মহিমার প্রথম বিকাশ ঘটিয়েছেন হযরত হাফেয আলহাজ্জ হেকীম নুরুদ্দিন (রা)। প্রতিষ্ঠিত সেই খেলাফতের ধারাবাহিকতায় আজ, এই ৫ম খিলাফত কালেও সত্যের বিরোধীতায় প্রচন্ড বাধা বিঘ্ন ও ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে সাফল্যের এক স্বর্ণযুগ অতিক্রম করে চলছে এই জামা'ত। অভ্যন্তরীন বিরোধীতা, একশ্রেণীর আলেম সমাজের মারমুখীতা, এমনকি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধীতার কবল থেকে আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা নিজ হস্তক্ষেপে এই খেলাফতের আশিসময় ধারাকে শান্তি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির ক্রমবর্ধমান সোপানে অবিরত উত্তরণ ঘটিয়ে চলছেন। আল্লাহ্ তাআলা আহমদীয়া খেলাফতকে নিজ কোলে তুলে রেখেছেন।

আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে আমরা এ উদ্দেশ্যে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন-ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সর্বপ্রকার কুরবানী প্রদান করতে আর ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি প্রান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.) এর দ্বারা সূচিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্প্রসারণে নিজেরা সর্বাত্মকভাবে নিবেদিত থাকব। সেই সাথে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.) এর মাধ্যমে ইসলামের পুনর্বিজয় যাত্রায় প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের এই ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট খেলাফতের সাথে আমাদের কৃত এ অঙ্গীকার পূরণে আল্লাহ্ তাআলা সর্বদাই আমাদের সাহায্য ও সহায় আছেন। আসুন! আমরা ইস্তেকামাতের সাথে এ অঙ্গীকার পালনে তৎপর থাকি, জামা'ত ও অংগসংগঠন সমূহের প্রতিটি কার্যক্রমের সাথে নিজেদেরকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে রাখি।

হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদের সবাইকে এমনই বানিয়ে দাও আর যুগ খলীফার স্নেহ-মমতা ভরা দৃষ্টিতে, পবিত্র সাহচর্যে ও দোয়ার কল্যাণের ছায়ায় নিজেদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অস্তিত্বকে তাঁরই সেবায় নিয়োজিত থাকায় অধিক থেকে অধিকতর যোগ্যতা ও সামর্থ্য দান কর। আমীন!

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (৯ সেপ্টেম্বর ২০১১)	৫
ধর্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করুন মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ	১২
ইসলামের ইতিহাস মূল: ড. আব্দুস সালাম ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ	১৪
খেলাফত : বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পন্থা মুহাম্মদ খলীলুর রহমান	১৭
শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) মাহমুদ আহমদ সুমন	২২
নামায সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৫
মরহুম কওছার আলী মোল্লা সাহেবের স্মৃতিচারণ- মোহাম্মাদ আব্দুল আজিজ ইন্টারনাল অডিটর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।	২৮
প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল	৩০
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন	৩২
নবীনদের পাতা	৩৩
পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে-	৩৭
সংবাদ	৩৮
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৪০

কুরআন শরীফ

সূরা ইবরাহীম-১৪

وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ قَالُوْا لَوْ هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ؕ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَجَزِعْنَآ اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ﴿۲۲﴾

২২। আর তারা সবাই আল্লাহ্‌র[১৪৬৩] সামনে উপস্থিত হবে। তখন দুর্বল লোকেরা অহংকারীদের বলবে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম। অতএব তোমরা আমাদের কাছ থেকে আল্লাহ্‌র আযাবের কিছুটাও কি দূর করতে পার?' তারা বলবে, 'আল্লাহ্ যদি আমাদের হেদায়াত দিতেন তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে হেদায়াত দিতাম। আমাদের জন্য (এখন) বিলাপ করা বা ধৈর্য ধরা উভয়ই সমান। আমাদের[১৪৬৪] রক্ষা পাওয়ার কোন পথ নেই।'

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ ؕ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّآ اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِيْ ۚ فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلُوْمُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ مَآ اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ؕ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَآ اَشْرَكْتُمُوْنِ مِنْ قَبْلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۳﴾

২৩। আর সব বিষয়ের যখন নিষ্পত্তি করে দেয়া হবে (তখন) শয়তান বলবে, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু আমিও সব সময় তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি এবং তা ভঙ্গ করেছি। আর আমি (যখনই) তোমাদের ডাক দিয়েছিলাম তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। এ ছাড়া তোমাদের ওপর আমার কোন আধিপত্য ছিল না। তাই (এখন) তোমরা আমাকে দোষারোপ না করে নিজেদেরকে দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধার কেউ নই এবং তোমরাও আমাকে উদ্ধার করার কেউ নও। তোমরা যে আগে আমাকে (আল্লাহ্‌র) শরীক করেছিলে নিশ্চয় আমি তা অস্বীকার করছি'। (এসব অংশীবাদী) যালেমদের জন্য নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব (অবধারিত) রয়েছে।

১৪৬৩। কোন জাতির প্রকৃত অপকর্মগুলো, যা কিনা তাদের অ:পতনের কারণ হয়, এতটা অধিক মারাত্মক হয় না যতটা তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ফাঁস হয়ে গেলে পর হয়। তাদের দুর্বলতা লোক সমক্ষে প্রকাশ হওয়ার ফলে তাদের নিকট নিজেদের কর্ম সম্পাদনেরও উর্ধ্বে তাদের মর্যাদা খ্যাতি, যা তাদের সফলতার প্রধান অবলম্বন, মরণাঘাতগ্রস্ত হয়। এতে তারা প্রতিপক্ষের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং তাদের পতন আর অবক্ষয় তাদের পশ্চাতে ধাবিত হয়। এটাই হলো, "তারা সকলেই আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হবে" বাক্যের মর্ম।

১৪৬৪। ধ্বংস যে জাতির নিয়তি হতাশার মধ্যে তারা গা ছেড়ে দেয় এবং নিজের নিকৃষ্ট অবস্থার নিকট সহজেই আত্মসমর্পণ করে বসে।

হাদীস শরীফ

নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তি মূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে, এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআন হতে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, আল্লাহ্ তাআলা ঈমান আনয়নকারী ও পুণ্যকর্মকারীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ-উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার ওপর সঠিকভাবে আমল করবে, তখন আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন,

"কিছু লোক ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানূ মিনকুম ওয়া আ'মেলুস সা'লেহাতে লাইয়াসতাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম" এর বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা 'মিনকুম' - (তোমাদের মধ্য হতে–অনুবাদক)-এর অর্থে শুধু সাহাবাদেরকে (রা.) নিয়ে থাকেন, এবং বলেন, খিলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের নাম-গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো, খিলাফত স্বপ্নের মত শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধ:পতনের অশুভ-গর্ভে নিপতিত হয়ে গেলো।

এগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে, তবে আমি কিভাবে বলতে পারি যে, সে-ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খিলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খিলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে, তবে মূসা (আ.)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল?

যেহেতু মানুষের কোন স্থায়ীত্ব নেই, তাই আল্লাহ্ তাআলা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্ত্বার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি -খিলাফত সৃষ্টি করেছেন, যাতে করে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনও বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত মানে, মূর্খতাবশতঃ সে খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদা তাআলার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূল করীম (সা.)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় কেবল তিরিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন, আর এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংসও হয়ে যায়, তবুও কোন পরওয়া নেই" (শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৩৪, পৃঃ ৫৮)।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে খিলাফতের রজ্জু ধারন করে এর আশিস হতে কল্যাণমন্ডিত হবার তৌফিক দান করুন, আমীন!

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

হে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণ! আমার কথা শুনো

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র শান্তি, রহমত ও আশিষ বর্ষিত হোক। এরপর হে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাগণ! আমার কথা শুনো। হে রোম, সিরিয়া-পারশ্য, মিশর, কাবুল এবং মক্কা ও মদীনার, যারা আমাদের সরদার আমাদের নবী খাতামান নাবীঈন (সা.)-এর হিজরতের পরের আবাসস্থল ও অন্যান্য দেশের ভ্রাতৃবৃন্দ! আল্লাহ্ তোমাদের উপর রহম করুন, তোমাদের সাহায্য করুন এবং তিনি যেন এ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তোমাদের সহায়ক হোন। তিনি আমাদের ও তোমাদের সুস্পষ্ট সত্যের দিকে হেদায়াত দান করেছেন।

আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির দিকেই আহ্বান করছি এবং সম্মানিত আল্লাহ্‌র নবী (সা.)-এর ওসীয়্যতের দিকে আহ্বান করছি, যাঁর (সা.) উপর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমান্বিত খোদার হাজার হাজার আশীষ বর্ষিত হোক। অত্যধিক স্নেহশীল ক্ষমাকারী খোদার আশীষ, যা এই দেশে প্রকাশিত হয়েছে, আমি তোমাদিগকে উহার সুসংবাদ দিচ্ছি। আর আমি তোমাদিগকে আল্লাহ্‌র (আশীষের) দিন ও সত্যবাদিগণের সুপ্রভাতের সুসংবাদ দিচ্ছি। আমাদের প্রভু যিনি সবচে' অধিক কৃপাকারী তাঁর তরফ হতে যে রহমত অবতীর্ণ হয়েছে আমি তোমাদিগকে তারও সুসংবাদ দিচ্ছি।

হে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ! মহিমান্বিত প্রতাপশালী আল্লাহ্ যখন এই পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি দিলেন তখন তিনি দেখলেন যে, এখানে ফিতনা ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছে, সততা কমে গেছে, হৃদয়গুলি পাষাণ হয়ে গিয়েছে ও অন্তরসমূহ সংকীর্ণ হয়ে গেছে। দিন যতই যাচ্ছে ও মাস যতই অতিবাহিত হচ্ছে ফিতনা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বিপদাবলী কঠোরতর হচ্ছে। আর পৃথিবী বিভিন্ন ধরণের বিদআতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কুরআন ও সুন্নতকে পরিত্যাগ করা হয়েছে, নিয়তের মাঝে বিপর্যয়ের অভিপ্রকাশ ঘটেছে এবং তাদের হৃদয়ে কামনা-বাসনার প্রবল আকর্ষণ স্থান করে নিয়েছে। তাদের ললাট হতে পুণ্যের জ্যোতিঃ মুছে গেছে। বরং তাদের চেহারায় বিশৃঙ্খলার ছাপ সুস্পষ্ট ও তাদের হৃদয় ঘোর কালিমায় পূর্ণ ও মৃত। তারা দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং শুস্ক হয়ে গেছে। তারা কাপুরুষ ও পশ্চাৎমুখী। তারা কুচিন্তা ও সন্দেহপ্রবণ।

নবীয়্যে মোস্তফা (সা.) যা কিছু দিয়ে গিয়েছিলেন, তা তারা ভুলে গেছে। কুরআনের নসিহত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.) যা বলে গিয়েছিলেন তারা তা-ও ভুলে গিয়েছে। তাদের হাতে এখন শুধু খোসাই রয়ে গেছে এবং তারা ঈমানের মূলকে নষ্ট করে দিয়েছে। তারা দুনিয়ার দিকে ও উহার ভালবাসার দিকে ঝুঁকে পড়েছে ও শয়তানের রাস্তাকে তারা বেছে নিয়েছে। তদের অধিকাংশকেই তুমি কেবল দুস্কৃতকারী, শঠ ও পাপকার্যে নির্ভীক দেখতে পাবে। তোমরা দেখছো যে, অধিকাংশ আলেম যা বলে বেড়ায় তা নিজেরাই করে না। সাধকদের দেখছো লোক দেখানো কর্ম করতে অথচ তাদের মাঝে নিষ্ঠা নেই। আর তারা দুনিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে না এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে না।

(হাকীকাতুল মাহ্‌দী, বাংলা সংস্করণ, পৃঃ ২৩)

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১১-এর জুমুআর খুতবা।

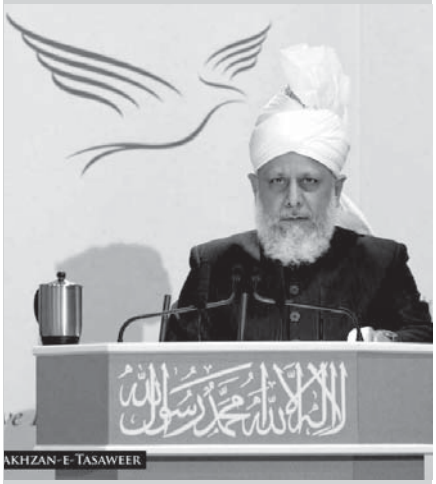

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

[সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে খুতবা না পাওয়ায় পূর্ব প্রকাশিত খুতবা পূণর্মুদ্রিত করতে হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।]

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

সত্যবাদীতা এমন একটি গুণ যা অবলম্বন করা সম্পর্কে কেবল ধর্মই নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, সে কোন ধর্ম মানুক বা না মানুক এই উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের উপর জোর দিয়ে থাকে।

সত্যবাদীতা এমন একটি গুণ যা অবলম্বন করা সম্পর্কে কেবল ধর্মই নয় বরং প্রত্যেক ব্যক্তি, সে কোন ধর্ম মানুক বা না মানুক এই উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলম্বনের উপর জোর দিয়ে থাকে। এতসব সত্বেও, এই মনোভাব প্রকাশের পরও, যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে (দেখা যাবে), সত্যবাদিতার সে ভাবে প্রকাশ ঘটেনা যেভাবে তা প্রকাশিত হওয়া উচিত। যে যখনই সুযোগ পায় ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গন্ডি পর্যন্ত সত্যবাদিতার উপর যত জোর দেয়া হয় সময়ে ততটাই একে জলাঞ্জলি দেয়া হয়। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। আর সেই প্রকৃত সত্যবাদিতা যাকে ক্বওলে সাদীদ (বা সহজ সরল কথা) বলা হয় তা উপেক্ষিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথিবীর এক বিশাল জনগোষ্ঠি মিথ্যার আশ্রয় নেয়। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রায় সময় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। দেশীয় রাজনীতিতেও সত্যের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সম্পর্কের ভিত্তিও মিথ্যার উপর রচিত আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমনটিই দেখা যায়। ধর্ম যা খাঁটি সত্য নিয়ে আসে এবং এর প্রচার করে, দুঃখজনকভাবে সেক্ষেত্রেও স্বার্থপররা মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সত্যের চরম ক্ষতি করেছে বা সত্যকে এমনভাবে গোপনের চেষ্টা করে যাতে সত্যের নাম-চিহ্নও দেখা না যায়। কতক লোক একথার উপর বিশ্বাস রাখে যে, এতো বেশি মিথ্যা বল যেন তা সত্য পরিগণিত হয় আর সত্য মিথ্যা গণ্য হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। সত্যকে সকল অর্থে পদদলিত করার ধৃষ্টতা জন্মেছে খোদা তা'লার সত্তায় বিশ্বাসহীনতার কারণে। যদি খোদা তা'লার প্রতি বিশ্বাস থাকতো তাহলে সকল পর্যায়ে এভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হতো না যেভাবে এযুগে বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নেয়া হয়। সত্যের মাধ্যমে কাজ নেয়া হয় না, এ কারণেই ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে দ্বন্দ-সংঘাত বৃদ্ধি পায়। আর সত্যের ভিত্তিতে কাজ না নেয়ার কারণেই স্বামী– স্ত্রীকে বিশ্বাস করে না আর স্ত্রীও স্বামীকে বিশ্বাস করে না। সন্তানদের মধ্যেও মিথ্যার বদভ্যাস গড়ে উঠে যখন তারা দেখে যে, পিতামাতা অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা বলছে ।

নবপ্রজন্ম যে বিভিন্ন অপকর্মে জড়িয়ে যায় এর জন্যও ঘরের মিথ্যাই মূলতঃ দায়ী। এভাবে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সত্যের অনুপম বৈশিষ্ট্য বা গুণ সৃষ্টির পরিবর্তে পরিবারকে ধ্বংস করে দেয়। নিজেদের সন্তানদের ধ্বংস করে। এছাড়া অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রের অবস্থা তথৈবচ। একইভাবে ব্যবসায়ীক মিথ্যা রয়েছে– যেভাবে আমি বলেছি, দুর্ভাগ্যজনক

ভাবে মুসলমান দেশগুলোতে এটি একটি সাধারণ ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। সততা এবং সত্যবাদিতার যত ঢোল পিটানো হয় কার্যতঃ ততটাই একে পদদলিত করা হয়। এভাবে দেশীয় রাজনীতি রয়েছে, এতেও সাধারণত মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়। কিন্তু মুসলমান হওয়ার দাবীদার দেশগুলো, যাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.) যত জোরালোভাবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং মিথ্যাকে ঘৃণা করার উপদেশ ও নির্দেশ দিয়েছেন, ততবেশি তারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে।

সম্প্রতী পাকিস্তানের করাচী এবং সিন্ধুর অবস্থা সম্পর্কে যখন একজন রাজনীতিবিদ নিজ দলের লোকদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে ভেতরের সকল কথা ফাঁস করে দিয়েছেন তখন কোন কোন রাজনীতিবিদ ও ভাষ্যকাররা মন্তব্য করলেন যে সত্য বলা রাজনীতিবিদদের কাজ নয় রাজনীতিবিদের কাছে আশা করা যায় না যে, তারা কখনও সত্য বলবেন। ইনি সত্য বলছেন, অতএব ইনি রাজনীতিবিদ নন, পাগল হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর কথাগুলোকে কেউ ভুল আখ্যা দেয়নি। সমালোচনা শুধু এটি হচ্ছে যে, সত্য বলছেন তাই ইনি উম্মাদ। ভাষ্যকাররা বলছেন, ইনি নিজের রাজনৈতিক জীবন এবং জাগতিক স্বার্থকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন যা কেবল একজন পাগলই করতে পারে। যেন তাদের কাছে সত্যবাদিতা বা সত্যতা অধঃপতনের কারণ। এই হলো তাদের অবস্থা।

সুতরাং তাদের দৃষ্টিতে রাজনীতি ও ক্ষমতা আল্লাহ্‌র বাণীর তুলনায় অগ্রাধিকার রাখে। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল বলছেন 'মিথ্যা বল না', কিন্তু এরা বলছে রাজনীতি ও ক্ষমতার খাতিরে মিথ্যা বল। যদি তুমি মিথ্যা না বল, তবে ভুল করবে। তারপরও এরা খাঁটি মুসলমান আর আহমদীরা মুসলমান নয়– যারা সত্যের খাতিরে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য, জাগতিক স্বার্থ এবং নিজেদের জীবনকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েছে। কারণ, তারা এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে। যিনি বলেন, 'মিথ্যা বলা শিরক'। তারা সেই নবী (সা.)-কে মান্য করে যাঁর প্রতি শেষ শরিয়ত গ্রন্থ পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। যাতে বিধৃত রয়েছে যে সকল মন্দ ও পাপের মূল হলো, মিথ্যা।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে নিন, সেক্ষেত্রেও মুসলমান রাষ্ট্রগুলো হোক বা পশ্চিমা সরকার, সবারই অবস্থা এক। ঐ দেশগুলো, যারা পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাধারণত সত্যের প্রকাশ করে থাকে, এক্ষেত্রে কিছুটা হলেও সত্য থাকে। কিন্তু যখন অন্য দেশের প্রশ্ন উঠে, মুসলমান দেশগুলোর প্রশ্ন উঠে, অন্যান্য দেশের প্রশ্ন উঠে তখন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে পাল্টে যায়। তাদের স্বরূপ প্রথম সে সময় প্রকাশ পেল– যখন তারা ইরাকের উপর আক্রমণ করল। যখন সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করতে গিয়ে ইরাককে ধ্বংস করে দিল। তাদের সম্পদের উৎসগুলোকে নিজেরা দখল করে নিল। তারপর বলল আমরা ভুল বুঝেছিলাম। সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে আমরা যে যুলম-অত্যাচার আর ভয়ংকর পরিকল্পনা, ভয়ংকর অস্ত্র-সস্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে অধীনস্থ করতে পারে বলে যে খবর পেয়েছিলাম, অতটা আমরা সেখানে পাইনি। তারপর লিবিয়াকে টার্গেট (লক্ষবস্তু) করা হলো , কিন্তু এখন বলছে, মূলতঃ আমাদের প্রাপ্ত তথ্য ভুল ছিল। এতটা যুলুম ও অত্যাচার সেখানকার জনগণের উপর হচ্ছিল না। এ সব কথা পশ্চিমা প্রেস বা সংবাদ মাধ্যমই প্রচার করছে। তাদেরই মন্তব্য প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথমে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে আক্রমণ করা হয়। তারপর সত্যবাদী সাজার উদ্দেশ্যে তাদেরই প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে বলে দেয়া হয় যে, আমরা ভুল বুঝে ছিলাম।

আমাদের যতটা বলা হয়েছিল ততটা প্রমাণিত হয়নি। এই সত্যও মূলতঃ মিথ্যাকে লুকানোর উদ্দেশ্যে বলা হয়। উদ্দেশ্য ছিল সম্পদের উৎসগুলো হস্তগত করা- যা হয়ে গেছে। কিন্তু এই সুযোগ ও মুসলমানরাই দেয়। যদি শতশত কোটি ডলারের দেশীয় সম্পদ জনকল্যাণে ব্যয় করা হতো তাহলে এমন অশান্তি দেশে কখনও মাথা চাড়া দিত না। আর না তারা হস্তক্ষেপের সাহস করত।

যাহোক, সারকথা হলো, আন্তর্জাতিকভাবে মিথ্যা বলা এবং সত্যকে কেবল গোপন করাই নয় বরং চরমভাবে পদদলিত করার ক্ষেত্রে মোটের উপর সারা পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ নিজ নিজ ভূমিকা রাখছে আর মনে করছে যে, তারা বেঁচে যাবে। এ দুনিয়ায় তারা বেঁচে গেলেও পরকাল বলতে কিছু আছে। একটি ভবিষ্যৎ জীবনও তারা পাবে; একটি ভবিষ্যৎ জীবনও আছে, যেখানে সমস্ত হিসাব-নিকাশ হবে। কেবল এই পার্থিবতার পূজারীরাই অপকর্মে লিপ্ত নয়; আমরা দেখছি, ধর্মের নামে ধর্মের তথাকথিত ঠিকাদাররাও সত্যকে প্রত্যাখান এবং মিথ্যার প্রসার করছে। এদের মাঝে ইসলামের শত্রু শক্তিগুলোও রয়েছে, যারা ইসলাম বিদ্বেষী।

এছাড়া এ যুগে মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিকের বিরোধীরাও রয়েছে অর্থাৎ মুসলমানরাও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ইসলামের শত্রু-শক্তির ভূমিকা পালন করছে। সত্যকে তারা জানে, কিন্তু নিজেদের স্বার্থ ও মিম্বরের (ক্ষমতার লোভে) জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়। সাধারণ মানুষের মন-মানসিকতাকে বিষিয়ে তুলতে একে অপরের সাথে পাল্লা দিচ্ছে। অনেকেই এমন আছে, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং আহমদী জামা'তের বই-পুস্তক পড়ে দরস বা পাঠ দেয়, বক্তৃতা করে অর্থাৎ আহমদীয়া জামা'তের বই পড়ে বক্তৃতা প্রস্তুত করে। কেননা এছাড়া তাদের কাছে ইসলাম বিরোধীদের মুখ বন্ধ করার মত আর কোন দলীল প্রমাণ নেই, কোন তথ্য নেই, সাহিত্য নেই। এ যুগে একমাত্র হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই জোরালো ও অকাট্য দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে ইসলামের সুরক্ষার বিধান করেছেন যে, কারো কাছে এর কোন উত্তর নেই। কিন্তু জনগণকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে তারা বলে বেড়ায় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই নাকি নাউযুবিল্লাহ্ মিথ্যা ব্যক্তি (আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাই)।

আমি পূর্বেও একবার উল্লেখ করেছি; কেউ একজন আমাকে বলেছেন, বিভিন্ন ব্যক্তি, বড় বড় আলেম যারা টেলিভিশনে এসেও দরস দিয়ে থাকেন, বক্তব্য রাখেন, তাদের বাসায় তিনি স্বয়ং তফসীরে কবীর এবং অন্যান্য গ্রন্থের বিভিন্ন খন্ড দেখেছেন আর এটি দু-একবার ঘটেনি। এগুলো কেবল আমাদের বিরুদ্ধে আপত্তি করার জন্য রাখে না, আপত্তি তো তারা করে লোক দেখানোর জন্য। তিনি বলেছেন, তারা এগুলো থেকে শিখে নিজেদের দরস ইত্যাদিতে তা বর্ণনা করে। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রতি তাদের কোন

আগ্রহ নেই। অতএব তারা জনগণকে সত্যের পথ দেখাবে না কেননা এভাবে তো মসজিদের মেহরাব ও মিম্বর তাদের হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। যাহোক, এ হলো তাদের অপচেষ্টা। প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্ যখনই তাঁর প্রেরিতজনকে পাঠান বিরোধীরা এই অপচেষ্টাই করে।

কিন্তু তারপরও আল্লাহ্‌র তক্বদীর বা সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রকাশ পায় এবং তাঁর তক্বদীরই সদা জয়যুক্ত হয়। সত্যকে আল্লাহ্‌র তক্বদীর অবশ্যই জয়যুক্ত করবে। এ জন্যই যুগে-যুগে আল্লাহ্ নবীদের আবির্ভূত করেন। যখন মিথ্যা চরম পর্যায়ে পৌঁছে, যখন বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য চরম রূপ ধারণ করে, সত্যের বিলুপ্তি ঘটে, তখন আল্লাহ্‌র প্রেরিতগণ আগমন করেন। নবীগণ আসেন যারা সত্যকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তারা বিরোধিতা সত্বেও সত্যের প্রচার করেন এবং অগ্রসর হতে থাকেন। তাদের রাস্তায় শত্রুরা লক্ষ লক্ষ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু তারপরও আল্লাহ্‌র তক্বদীর-ই বিজয় লাভ করে। আল্লাহ্‌র তক্বদীর বা সিদ্ধান্ত নবীদের পক্ষে থাকে, প্রেরিতগণের সাথে থাকে, তাঁদের সাহায্য করে থাকে।

বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথেও এটিই আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি এবং আল্লাহ্ তা'লা নিজ অনুগ্রহে তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করে চলেছেন। তারা জলসা করে, মিছিল বের করে, অত্যাচার করে। এবার ৭ সেপ্টেম্বরের প্রেক্ষিতে পাকিস্তানে অনেক জলসা হয়েছে, রাবওয়ায় জলসা হলো; তাদের বড় বড় আলেমরা, শীর্ষস্থানীয় আলেমরা সেখানে যায় এবং গিয়েছে আর জলসার নাম দেয়া হয় 'তাজদারে খতমে নবুয়ত কনফারেন্স' কিন্তু সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে গালমন্দ করা বা জামা'তের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছাড়া আর কিছু হয় না। সারারাত এভাবে অপালাপ করতে থাকে আর এ সবকিছু আল্লাহ্ ও রসূলের নামে। যাহোক, এই হলো তাদের অবস্থা।

তারপরও আল্লাহ্ তক্বদীর বা নিয়ম চলছে। জামা'তের অগ্রগতি অব্যাহত আছে। এটা যদি আল্লাহ্‌র তক্বদীর না হতো, তিনি যদি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ না করেন, তাঁর প্রেরিতগণ যদি বিজয়ী না হন তাহলে নাউযুবিল্লাহ্ আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ভুল প্রমাণিত হবে এবং ধর্মের প্রতি, নবীদের প্রতি, সর্বোপরি আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের বিশ্বাস উঠে যাবে।

কাজেই আল্লাহ্ তা'লা এ ঈমাকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য, পুণ্যবানদের ঈমানকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে এমন সব দৃশ্য দেখিয়ে থাকেন যা তাদের ঈমানকে দৃঢ় করার কারণ হয়। কোন কোন ধর্মমত অতীতের সত্য ঘটনাবলী বর্ণনা করার মাধ্যমে অনুসারীদের ঈমানকে দৃঢ় করে থাকে, কোন কোনটি সতেজ এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী বর্ণনা করে এই ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা ও তাদের ধর্মের সত্যতা সম্পর্কিত নিদর্শনাবলীর বিবরণ দিয়ে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে আর এ ধর্মের মান্যকারীরা উদ্বুদ্ধও হয়।

কিছু সংখ্যক মানুষকে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিজ প্রেরিত পুরুষের সত্যতা অবগত করে পথ প্রদর্শন করেন। মোট কথা হলো, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত মহাপুরুষের সত্যতা ও সততাই তাঁর জীবনে অর্থাৎ সেই নবীর জীবনে, সেই প্রেরিত মহাপুরুষের জীবদ্দশায় তাঁর প্রতি মানুষের মনোযোগ আকৃষ্ট হবার কারণ হয়ে থাকে। আবার কিছু মানুষ পরবর্তীতে ধর্মের উন্নতি দেখে এর অনুসারীদের আচরণ দেখে, সেই নবীর আদর্শ অনুসরণকারী জামা'তের আমল বা কর্ম প্রত্যক্ষ করে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দিক নির্দেশনা পেয়ে হিদায়ত লাভ করে থাকেন।

যাহোক, আমরা মহানবী (সা.)-এর জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবো, সে যুগের কাফিররাও তাঁকে 'সাদুক' এবং 'আমীন' নামেই আখ্যায়িত করতো। এটি তাঁর বিরল সততারই প্রভাব ছিল যার ফলশ্রুতিতে তিনি যখন তাঁর নিকটাত্মীয় ও মক্কার নেতাদের একত্র করে বলেছিলেন, আমি যদি তোমাদের বলি এই টিলার পেছনে এমন একটি সেনাদল লুকিয়ে আছে যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো না– তোমরা কি আমার একথা বিশ্বাস করবে? বাহ্যতঃ এটি এক অসম্ভব বিষয় ছিল। এর আড়ালে সেনাদল জড় হয়ে থাকলে দেখতে না পাবার কোন কারণ ছিল না।

কিন্তু এসত্ত্বেও তারা সবাই সমস্বরে বলেছিল, হে মুহাম্মদ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তুমি কখনও মিথ্যা বল নি, তাই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করবো। এরপর তিনি (সা.) তাদেরকে তবলীগ করলেন। কিন্তু এরা জগতমুখী মানুষ ছিল। পাথরের মত কঠিন হৃদয়ের মানুষ ছিল। তাই এদের মনে তাঁর কথা রেখাপাত করে নি। এদের পরিণামও মন্দ হয়েছিল। এদের কিছু সংখ্যক পরবর্তীতে মুসলমান হয়েছিল।

মোট কথা, নবী রসূলগণ নিজেদের সততার বলেই জগতবাসীকে নিজেদের দিকে আহ্বান ও আকৃষ্ট করেন। পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.)-এর তবলীগের উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁরই মুখনিঃসৃত এ শব্দগুলো বর্ণনা করে বলে,

فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মাঝে একটি দীর্ঘ জীবন কাটিয়েছি তবুও কি তোমরা বিবেক বুদ্ধি খাটাবে না? (সূরা ইউনুস:১৭)। এটি সেই যুক্তি যা তিনি নিজ নবুয়তের সত্যতা ও খোদার পক্ষ থেকে প্রেরিত হবার স্বপক্ষে প্রদান করেন। আর তা হলো, আমি তোমাদের মাঝে একটি জীবন পার করে এসেছি কিন্তু কখনও মিথ্যা বলি নি। এখন আমি যখন বার্ধক্যে উপনীত হতে চলেছি, এখন কি আমি মিথ্যা বলতে পারি? আবার তাও খোদার বিরুদ্ধে? সেই খোদার বিরুদ্ধে যিনি মিথ্যাচারকে শিরক বা অংশীবাদিতার সমকক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন? এই কথাটি আমারই আনা শিক্ষার মাঝে নিহিত রয়েছে। আমার আগমনের উদ্দেশ্যই হলো, 'তওহীদ' বা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা। এই ছিল মহানবী (সা.)-এর উত্তর। অতএব নবী রসূলদের তবলীগের একটি মোক্ষম অস্ত্র ও পদ্ধতি হলো, তাঁদের সততা ও সত্যবাদিতার দাবী। তাঁদের জীবনের প্রতিটি আঙ্গিকে সততা ও সত্যবাদিতার ঝলক দেখা যায় যার বরাতে তাঁরা তাঁদের তবলীগ পরিচালনা করেন এবং সত্যের বাণী পৌঁছে থাকেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতিও ইলহাম হয়েছিল 'ওয়ালাকাদ লাবিসতু ফিকুম উমরাম মিন কাবলিহি আফালা তা'কিলুন' অর্থাৎ আমি তোমাদের মাঝে এক দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করে এসেছি। তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি নেই? এ প্রসঙ্গে নুযুলুল মসীহ্ পুস্তকে হযরত মসীহ্ মওউদ

(আ.) বলেছেন:

১৮৮২-এর দিকে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই ওহী দ্বারা সম্মানিত করেন: 'ওয়ালাকাদ লাবিসতু ফিকুম উমরাম মিন কাবলি- হিআফাল-তা'কিলুন' এতে অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত খোদা এ দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন যে, কোন বিরুদ্ধবাদী তোমার জীবনীতে কোন ধরনের কালিমা লেপন করতে সক্ষম হবে না। তদনুযায়ী, এ সময় আমার বয়স পয়ষট্টি (৬৫) চলছে (যখন এ লেখাটি লিখেছেন) কাছের বা দূরের কোন মানুষ আমার অতীত জীবনে কোন ধরনের কালিমা লেপন করতে পারে নি বরং আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং অতীত জীবনের পবিত্রতার সাক্ষ্য বিরুদ্ধবাদীদের মাধ্যমেই প্রদান করিয়েছেন।

যেমন, মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব তাঁর পত্রিকা 'ইশাআতুস সুন্নাহ্'তে' অত্যন্ত জোড়ালো ভাষায় আমার ও আমার পরিবারের প্রশংসা করেছেন। (এ প্রশংসা করতে গিয়ে) তিনি এ দাবীও করেছেন যে, আমার ও আমার পরিবার সম্পর্কে তাঁর চাইতে অধিক অন্য কেউ জানে না। তিনি সঙ্গত কারণেই নিজ জ্ঞান অনুযায়ী প্রশংসা করেছেন। সুতরাং এমন ব্যক্তি যে কুফুরী ফতওয়া দেবার ভিত্তি রেখেছে সে নিজেই ভবিষ্যদ্বাণী 'ওয়ালাকাদ লাবিসতু ফীকুম'-এর সত্যায়নকারী হয়েছে।

অতএব সত্যবাদিতা এমন এক বিষয় যা নবীর সত্যতা প্রমাণ এবং তবলীগের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীর এই দাবীকে 'আমি এক দীর্ঘ জীবন তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি, কখনও মিথ্যা বলিনি আর এখন বলব'? এ কথাকে তিনি তাঁর প্রিয়জনের একটি বিশেষগুণ ও বৈশিষ্ট্য হিসেবে তুলে ধরেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কীত এ উদ্ধৃতি যা এখন শুনেছেন তা নিশ্চয় আপনারা পড়েছেন ও শুনে থাকবেন। যেখানে কোন শত্রুও তিনি (আ.)-এর জীবনীকে কলঙ্কিত করতে পারেনি সেখানে সত্যবাদিতা যা জীবন চরিতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য সেক্ষেত্রে কিভাবে বলা যায় যে নাউযুবিল্লাহ্ তিনি (আ.) মিথ্যাবাদী। অতএব বর্তমান যুগের মৌলভীরা অথবা আপত্তিকারীরা যা ইচ্ছা বলতে থাক।

(তাতে কি আসে যায়)। হ্যাঁ, তারা বকবক করে কিন্তু কোন কিছুই প্রমাণ করতে পারেনি। আজও যারা নিষ্ঠাবান এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার কাছে হিদায়াত ও সাহায্য চায় আল্লাহ্ তা'লা তাদের সামনে [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)]-এর সত্যতা প্রকাশ করে দেন। গত জুমুআতেই আমি এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছি, যারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেছে এবং সাহায্য চেয়েছে আল্লাহ্ তা'লা কিভাবে তাদের কাছে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবীর সত্যায়ন করেছেন।

এ সত্যই নবীগণ এনে থাকেন। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রকাশ ঘটে থাকে। আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছি আমাদেরকে এ সত্যই পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে হবে। কেননা নবীর মান্যকারীদের দায়িত্ব হলো, যে নবীকে তারা মানে তার সত্যতা জগদ্বাসীর সামনে তুলে ধরা এবং মানবজাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়া। এ যুগে ইসলামই সেই শেষ ধর্ম যা সব সত্যের কেন্দ্রবিন্দু। এটিই সেই একমাত্র ধর্ম যা নিজ শিক্ষাকে আসলরূপে উপস্থাপন করে থাকে।

এটিই একমাত্র ধর্ম যেখানে এখনও খোদা তা'লার কিতাব মূল অবস্থায় বিদ্যমান এবং ইনশাআল্লাহ্, কিয়ামত পর্যন্ত অনুরূপই থাকবে। এটিই কুরআনের দাবী। এ কিতাব সততা ও হিদায়াতের উৎস। অন্যান্য সব ধর্মীয় গ্রন্থে গল্প-কাহিনী ও মিথ্যার সংমিশ্রন ঘটেছে। পৃথিবীবাসীকে এই সত্যের সাথে পরিচিত করানো প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান আজ মন্দকর্মে লিপ্ত তারা কিভাবে অন্যকে সত্য পথের সন্ধান দিবে। আর এ বিষয়টি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি।

একবার একটি অনুষ্ঠানে কথা হচ্ছিল আর সেখানে উপস্থিত সবাই ছিল খ্রিস্টান। কথা হচ্ছিল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে বাণী নিয়ে এসেছেন তা সমগ্র পৃথিবীবাসীর জন্য, মুসলমান ও খ্রিস্টান সকলের জন্য। ইনশাআল্লাহ্ তা'লা সৎ প্রকৃতির লোকেরা তাঁর হাতে একত্রিত হবে হোক না সে মুসলমান, খ্রিস্টান বা হিন্দুদের কেউ। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্রিস্টান প্রফেসর যে ধর্মের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখে, আমাকে বললো প্রথমে মুসলমানদের সংশোধন করে নিন তারপর আমরা যারা খ্রিস্টান আমাদের সংশোধন করেন। যাহোক, আমি তাকে যথাযথ উত্তর দিয়েছি।

তবে আসল কথা হলো, মুসলমানদের সংশোধন হওয়া আবশ্যক আর অনেক সময় মুসলমানদের কারণে লজ্জায় পড়তে হয়। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মুসলমানদের সংশোধনের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন। হযরত রসূলে করীম (সা.) মুসলমানদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, ইমাম মাহদী যখন আসবে বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হলেও যাবে এবং তাঁকে মানবে। আমরা যারা মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের জামা'ত হবার দাবী করে থাকি– এ বাণী আমাদেরকে জগতময় ছড়িয়ে দিতে হবে। কিন্তু কীভাবে? প্রথমে নিজেদেরকে সত্যবাদী প্রমাণ করতে হবে। নবীরা নিজের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে নিজেদের জীবনের সত্যের উদাহরণ দিয়ে উপস্থাপন করেছেন যে, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ বিষয় থেকে শুরু করে চরম কঠিন অবস্থাতেও মানুষের সাথে লেনদেন বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা কখনো মিথ্যা বলিনি। সত্যবাদিতার এ প্রকাশ আমাদেরকেও আমাদের জীবনে ঘটাতে হবে। এটিই নবীর মান্যকারীদের কাজ। নবীগণ যেভাবে নিজেদের উদাহরণ দিয়ে থাকেন, তাঁদের প্রকৃত মান্যকারীদেরও নিজেদের সত্যবাদিতাকে এমন সুন্দরভাবে তুলে ধরতে হবে যেন তা পৃথিবীবাসীর চোখে পড়ে।

আমাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শকে অনুসরণ করি। তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণ করে সত্যবাদিতার মত নৈতিক গুণকে আমাদের সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে। তবেই আমরা হযরত রসূল করীম (সা.)-এর বাণীকে সারা বিশ্বে পৌঁছাতে সক্ষম হবো। তবে সত্যবাদিতার এ মান আমরা তখনই অর্জন করতে পারবো এবং আমাদের কথা তখনই প্রভাব বিস্তারী হবে যখন আমরা আমাদের কথায় ও কাজে, প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি মুহূর্তকে সততার গুণে সজ্জিত করবো। আমাদের পারিবারিক জীবনে, ঘরে-বাইরে এবং সমাজ ও পরিবেশে আমাদের সত্যবাদিতা এক উদাহরণ হলে পরেই আমাদের কথার

সত্যতা অন্যদেরকে প্রভাবিত করে আহমদীয়াত ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করবে। তবে এর জন্য আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। আমাদের কর্মকে সত্যবাদিতার মাধ্যমে অলংকৃত করতে হবে। ছোট-ছোট আর্থিক স্বার্থেও মিথ্যার আশ্রয় নিলে আমাদের কথায় কোন প্রভাব পড়বে না। আমি পূর্বেও বলেছি, উদাহরণ স্বরূপ, মিথ্যা বলে আমরা যদি সরকার ও কাউন্সিল থেকে আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করি অথবা আমরা যদি সঠিকভাবে কর না দেই আর ধরা পড়ি তবে এতে জামা'তের দুর্নাম হয়। কেননা একজন আহমদীর ব্যাপারে সবাই জানে যে, এ আহমদী। তাই দুনার্ম হলে তবলীগ কিভাবে হবে? আপনারা কিভাবে প্রমাণ করবেন, যে জামা'তের সাথে আপনার সম্পর্ক, সেই জামা'ত মন্দকর্মে লিপ্ত হয় না, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং অন্যান্য মুসলমানদের চেয়ে পৃথক, আর এরূপ হবার কারণ হলো এ জামাত এ যুগে সেই ব্যক্তির হাতে বয়আ'ত করেছে যিনি জগদ্বাসীকে সঠিক পথ প্রদর্শন করতে এসেছেন। একথা প্রমাণ করা কঠিন হয়ে যাবে।

সুতরাং এটি প্রমাণের জন্য আমাদের আমল বা কর্মের সংশোধন করতে হবে এবং ছোট খাটো বিষয়েও সাবধান থাকতে হবে। নতুবা কিভাবে প্রমাণ করবেন আমরা কুরআন ও সুন্নতের অনুসরণকারী। সুতরাং এ (তবলীগের) কাজের প্রসার ও জামা'তের সুনামের জন্য নিজেদের সংশোধনের প্রতি অনেক যত্নবান হতে হবে। মিথ্যা ধরা পড়লে আমরাই যে শুধু নিজেদেরকে বিপদে ফেলি তা নয় বরং জামাত ও ইসলামের জন্যও দুর্নামের কারণ হই। এছাড়া অন্যান্য আরো অনৈতিক কার্যকলাপ রয়েছে। কতক যুবকের অসৎ সঙ্গীদের সাথে উঠাবসা, স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক ঝগড়া ইত্যাদি। আর এ বিষয়ে আমি পূর্বেও বলেছি যে, এমন বিষয়াদি অনেক সময় থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়ায়। তখন কোন না কোন পক্ষ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকে। যাহোক, এসব বিষয় জামাতের জন্য দুর্নাম বয়ে আনে এবং সমাজে খারাপ প্রভাব সৃষ্টি হয়ে তবলীগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এছাড়া মিথ্যা বলার বদভ্যাস হয়ে গেলে জামাতেও বিভিন্ন বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়। এই মিথ্যার কারণে প্রত্যেক বিষয় থেকেই বরকত উঠে যেতে থাকে।

যেভাবে আমি বলেছি, এরফলে ঘরেও সন্তানদের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে, কথার প্রভাব পড়ে না। অনেক ছেলে-মেয়ে আমাকে লিখেও দেয় যে, বাহিরে বাহ্যতঃ আমাদের পিতা অত্যন্ত নেক, ভদ্র, সৎ এবং ধার্মিক হিসাবে খ্যাত, জামাতের খিদমতকারীও বটে কিন্তু আমরা জানি, ঘরে তিনি বাজে কথা বলেন এবং তা সততা বিবর্জিত। কথা হলো, এমন পিতাদের সন্তানদের উপর কি প্রভাব পড়বে বা এমন মায়েদের সন্তানদের উপর কি প্রভাব পড়তে পারে যারা মিথ্যা বলার মধ্যেমে কার্যসিদ্ধি করে থাকেন? যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয় এবং বলে, আমরা নির্দোষ, সবকিছু ঠিক আছে। এমন লোকদের তবলীগ বা অন্য কথারও কোন প্রভাব পড়ে না। যাদের নিজ ঘরের সন্তানদের উপরেই প্রভাব নেই, ঘরের সন্তানরাই তাদের কাছ থেকে মন্দ প্রভাব গ্রহণ করে বা যাদের উপর মন্দ প্রভাব পড়ে তারা বাইরে গিয়ে কি সংশোধন করবে?

কাজেই প্রত্যেক আহমদীর এ বিষয়টির প্রতি গভীর দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আমাদের মাঝে যদি এ বিষয়গুলো সৃষ্টি হয় আর বাড়তে থাকে তাহলে তো আমরা ঐ লোকদের অন্তর্ভূক্ত হব যারা বলে কিছু আর করে অন্য কিছু। আমরা এ ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকি যে, আহমদীয়াত সত্য এবং প্রকৃত ইসলাম। আমরা এ ধ্বনি উচ্চারণ করে থাকি যে, ভালবাসা সবার তরে, ঘৃণা নয় কারো পরে। কিন্তু সর্ব প্রথম আমাদেরকে নিজের ঘরে ভালবাসা দিতে হবে আর সেখানে সত্যবাদিতা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, নিজের প্রিয়দের ও আত্মীয়-স্বজনকে ভালবাসা দিতে হবে। নিজের জামাতের সদস্যদের মাঝে, নিজের পরিবেশে ভালবাসা ছড়াতে হবে তাহলেই আমাদের ভালবাসার গন্ডি ব্যাপকতর হতে থাকবে। তাহলেই সত্যের মাধ্যমে সত্যের প্রসার হবে। নতুবা আমাদের এ ধ্বনি অন্তসারশূন্য হবে, আমরা মিথ্যা ধ্বনি উচ্চারণকারী হব। আমাদের ঘরে অশান্তি আর আমরা অন্যদের আহ্বান করছি যে, আস সত্যকে পেয়ে নিজেদের অশান্তিকে দূর কর। আমরা অন্যদের নিকট গিয়ে ভালবাসার প্রচার করছি অথচ আমাদের প্রতিবেশী যারা এর চেয়ে বেশী অধিকার রাখে তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক ভাল নয়। পবিত্র কুরআনে প্রতিবেশীর সর্বাধিক অধিকারের কথা উল্লেখ করে। ইসলামে প্রতিবেশীকে সর্বাধিক অধিকার দেয়া হয়েছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের ধর্মীয় ভাইও তোমাদের প্রতিবেশী। কেবল ঘরের পাশের ঘরে বসবাসকারীই প্রতিবেশী নয় বরং প্রত্যেক ধর্মীয় ভাই তোমার প্রতিবেশী, তার প্রাপ্য প্রদান কর। তাই আমরা যদি সত্য হয়ে থাকি তাহলে পারস্পারিক সম্পর্কেও শক্তিশালী করতে হবে নতুবা আমাদের তবলীগ কল্যাণহীন থেকে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা কেন তা বল যা কর না? (সূরা আস্ সাফ্ফ:৩)।

কেননা তোমাদের আমল বা কর্ম যদি কথার সাথে সামঞ্জস্য না রাখে তাহলে এটি কপটতা, এতে কখনো কল্যাণ আসতে পারে না সবসময় অকল্যাণই সৃষ্টি হবে। নিজের কথা ও কাজের বিরোধের মাধ্যমে ঈমানকে কলুষিত করবে না। তোমরা যে সত্য এবং পূর্ণাঙ্গীন নবীর আন্তরিক প্রেমিকের সাথে যুক্ত হয়েছ অথবা যুক্ত হওয়ার দাবী কর তাঁর সাথে প্রকৃতপক্ষে তখনই যুক্ত হবে যখন কেউ এ কথা বলে তোমার প্রতি আঙ্গুল উঠাতে পারবে না যে, এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী।

প্রত্যেক আপত্তিকারী এটিই বলবে যে, এই ব্যক্তি যেহেতু নিজে মিথ্যাবাদী তাই যার সাথে যুক্ত হয়ে সে যার সত্যতার ঘোষণা করছে তাঁর সত্যতা সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। এ কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমাদের দুর্নাম করবে না। অতএব আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, আহমদীয়াতের বিজয়ের জন্য সততা ও সত্যবাদিতাই হচ্ছে অস্ত্র যা আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই ইসলামের শিক্ষা সত্য, পবিত্র কুরআন সত্য আর এ শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

মহানবী (সা.) শেষ শরিয়তধারী নবী আর এখন কোন নতুন শরিয়ত, কোন নতুন সত্য আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হবে না। নবুওয়তের সকল পরাকাষ্ঠা তাঁর সত্তায় বিকশিত হয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই

যে, মহানবী (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের দাবী সত্য, তিনিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল আর এখন ইসলামের উন্নতি আহমদীয়াতের উন্নতির সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এ উন্নতির অংশীদার হওয়ার জন্য, এ সত্যকে প্রচার করার জন্য আহমদীদের যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালনে আমাদেরকে কর্মে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে।

আমরা যে শিক্ষা প্রচার করি সে শিক্ষা অনুযায়ী নিজেদের গড়তে হবে। আমরা যদি সেই বিজয়ের অংশীদার হতে চাই যা ইনশাআল্লাহ্ ইসলামের জন্য নির্ধারিত, এ যুগে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান প্রেমিকের সাথে আল্লাহ্ তা'লা যে বিজয়ের অঙ্গীকার করেছেন আমরা যদি সেই বিজয়ের অংশীদার হতে চাই তবে সর্বদাই আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, আমরা কতটা সত্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের পরিবারে, আমাদের সমাজে, আমাদের জামাতী বিষয়ে এবং আমাদের ব্যবসায়ীক লেনদেনের ক্ষেত্রে আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করে দেখা উচিত।

এর ফলাফল যদি উৎকণ্ঠার কারণ হয় তাহলে আমাদের ভাবা উচিত। নিঃসন্দেহে আহমদীয়াত বিজয় লাভ করবে ইনশাআল্লাহ্। আর প্রতি দিনই আমরা এ বিজয় প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু যারা প্রকৃত অর্থে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে না তারা এ বিজয়ের অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। অতএব, এটি একটি দুঃচিন্তার বিষয়। আমাদের ভাবা উচিত, এ সত্যকে পাওয়ার পর আমরা কিভাবে আমাদের আমল বা কর্মকে মিথ্যা হতে পবিত্র করতে পারি। সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে থাকা উচিত যে, মিথ্যা হলো শির্ক।

যে সব আহমদী সত্যের বিকাশ ও সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ স্বীকার করেছেন, মনে রেখো! তারা আসলে অংশিবাদী বা শির্কের বিরুদ্ধে ত্যাগ স্বীকার করছেন। তাঁরা পৃথিবীতে এক ও অদ্বিতীয় খোদার রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ স্বীকার করছেন। তাঁরা স্বৈরাচারী প্রশাসন ও সরকার এবং নিপীড়নকারী মোল্লাদের এ কথার বিরুদ্ধে ত্যাগ স্বীকার করছেন যে, তোমরা যদি জীবন চাও, তোমরা যদি তোমাদের সম্পদের নিরাপত্তা চাও, এবং তোমরা যদি তোমাদের সন্তানদের শান্তি কামনা কর তবে সত্য পরিত্যাগ করে মিথ্যাকে আপন করে আমাদের পিছু নাও। অতএব, এ সব আত্মত্যাগীরা যে উদ্দেশ্যে কাজ করছেন, আমরা যারা বাহিরে থাকি অর্থাৎ এমন প্রতিটি আহমদী যারা তুলনামূলক ভাবে শান্তিতে জীবনযাপন করছে, তাদের দায়িত্ব সত্যের মান এতোটা উন্নত করা যেন মিথ্যার সমাধি রচিত হয়। যখন আমরা পূত-পবিত্র মনমানসিকতা নিয়ে এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে চেষ্টা করব তখন মিথ্যার জন্য পলায়ন বা মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না।

মক্কা বিজয়ের সময় আবু সূফিয়ান মহানবী (সা.)-কে এ কথাই বলেছিল, যে শোচনীয় অবস্থায় আপনি মক্কা ত্যাগ করেছিলেন এবং আপনাকে ধ্বংস করার জন্য আমরা যে চেষ্টা চালিয়ে ছিলাম, যদি আমরা সত্য হতাম আর আমাদের উপাস্য শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হতো তবে এর ফলে আপনার স্থলে আমরা বসতাম। কিন্তু আবহমান রীতি অনুসারে আজও প্রমাণ হয়েছে, আপনি আপনার জীবনের প্রতিটি বিষয়ে যেভাবে সত্যবাদিতা অবলম্বন করেছেন এবং আপনার মুখ থেকে যেভাবে সর্বদা সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছু বের হয়নি সেভাবে আপনার এ ঘোষণাও সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, এ বিশ্বজগতের একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন, তাঁর ইবাদত কর এবং প্রকৃতভাবে তাঁর বন্দনা কর। আপনার এ ঘোষণা তখনও সত্য ছিল আর আজও সত্য যে, তিনি-ই সত্য খোদা। নিশ্চয় ইসলামের খোদা সত্য খোদা এবং তাঁর মান্যকারীরাও সত্য। এ জন্য আবু সূফিয়ান ঘোষণা করেন, আমিও কলেমা পাঠ করছি এবং এভাবেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। অতএব, এটা সত্যের দৃষ্টান্ত যা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছে। যা চরম শত্রুদেরও সত্যের দোরগোড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে।

অতএব মহানবী (সা.) যেভাবে এ পৃথিবীকে চরম নৈরাজ্যের মাঝে পেয়ে সত্যের আলোয় সেই বিশৃঙ্খলা দূর করে খোদাপ্রেমী মানুষ বানিয়েছেন এবং প্রতিমা পূজারীদেরকে একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সত্য এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি মক্কার কাফিরদের দম্ভ-অহংকার ও মিথ্যাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথেও একই প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আমি যেমন বলেছি, তাঁর মাধ্যমেও ইসলামের বিজয় সাধিত হবে; এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। কিন্তু এজন্য আমাদেরকে খোদাভক্ত হতে হবে। নিজেদের জীবনে সত্যকে বরণ ও অবলম্বন করতে হবে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেদের ঈমান দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করা আবশ্যক যেন আমরা সেই বিজয়লগ্ন স্বচক্ষে অবলোকন করতে পারি।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে আমরাই এই মর্মে বয়'আতের অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা ধর্মকে পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দিব, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবো, মিথ্যা ও শির্কের অবসান ঘটাবো। অতএব, এ যুগে সত্যের বহিঃপ্রকাশ এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করা আহমদীদের কাজ। কেননা আমরাই তারা, যারা পরম সত্যবাদী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাস হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়'আত করে সত্যকে ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করার অঙ্গীকার করেছি। আর অঙ্গীকার পূর্ণ করার ব্যাপারে আমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী জিজ্ঞাসিত হবো। তাই এটি অত্যন্ত চিন্তা ও ভয়ের ব্যাপার। আমাদেরকে সর্বদা মনে রাখতে হবে, নিজেদেরকে সত্যের আদর্শে গড়ে তুলতে না পারলে আমরা কখনো তৌহিদ (বা একত্ববাদ) প্রতিষ্ঠাকারী এবং সেই সত্যের প্রসারকারী হতে পারবো না যে সত্যের প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছিলেন। সেই সত্য যা আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, মুসলমানের কৃতকর্মের দরুন তা আজ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। আর এই পৃথিবী ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (জল ও স্থলে নৈরাজ্য ছেয়ে গেছে)-এর বাস্তব চিত্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বান্দার প্রতি অসীম অনুগ্রহ পরায়ণ আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এবং তাঁর মাধ্যমে একটি জামাত প্রতিষ্ঠা করে তা দূর করার ব্যবস্থা করেছেন।

খিলাফত আলা মিনহাজিন্নাবুয়ত-(নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা)-র মাধ্যমে একটি জামাতের উন্মেষ ঘটিয়ে আশার আলো দেখিয়েছেন। কাজেই সর্ব পর্যায়ে এই নৈরাজ্য দূর করা এবং সত্য প্রতিষ্ঠা করা আর এজন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রত্যেক সেই আহমদীর দায়িত্ব যে জামাতের সাথে সংশ্লিষ্টতার দাবী করে।

আমাদেরকে নিজেদের ঘর থেকে এই নৈরাজ্য ও মিথ্যার অবসান ঘটাতে হবে যা ঘরে বিভিন্ন অশান্তি সৃষ্টি করে। আমাদেরকে এই নৈরাজ্য নিজ মহল্লা থেকেও দূর করতে হবে। নৈরাজ্য ও মিথ্যাকে আমাদের শহর থেকেও দূর করতে হবে এবং এই পৃথিবী থেকেও এই নৈরাজ্য ও মিথ্যাকে নিপাত করতে হবে। যাতে জগতে প্রেম, ভালবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ একটি পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা সেই রসূলের মান্যকারী যিনি সকল প্রকার নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা দূর করতে এসেছিলেন। যিনি বিশ্বের জন্য রহমত হয়ে এসেছিলেন। যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

অর্থাৎ আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক রহমত স্বরূপেই পাঠিয়েছি। তাই পৃথিবীতে সত্যের জয়গান গেয়ে আর নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়েই মহানবী (সা.) রহমত সাব্যস্ত হবেন। অতএব আজ এই পরম সত্যবাদী ও রহমাতুল্লিল আলামীনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই আমাদের দায়িত্ব। স্বজনদেরকেও সত্যবাদিতার মাধ্যমে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করুন, প্রেম ও ভালবাসার বাণী পৌঁছান। আর অন্যদেরও সত্যের অস্ত্র দ্বারা পরাভূত করুন। পিস্তল, বন্দুক, রাইফেল ও কামান– গুলি ছুড়ে আর গোলাবারুদ বর্ষণের মাধ্যমে প্রাণ নাশের কারণ হয়। কিন্তু সত্যের অস্ত্র প্রাণপ্রদ হয়ে থাকে তা নিজেদের কর্ম ও আচরণের মাধ্যমে আমাদের চালাতে হবে।

অতএব, আজ প্রত্যেক আহমদীকে এই অস্ত্র হাতে বের হওয়া উচিত। আল্লাহ্ করুন, সত্য বিস্তারের এই আধ্যাত্মিক অস্ত্র ব্যবহার করে বিশ্বের সৎ প্রকৃতির লোকদের এবং পুণ্য সন্ধানীদের সমবেত করে আমরা যেন সত্যের এমন প্রাচীর গড়তে পারি যাকে মিথ্যা ও শয়তানী শক্তির বলে কোন মিথ্যাবাদী ও শয়তান বিধ্বস্ত করতে না পারে। আর সত্যের এই জ্যোতি জগতে প্রসার ও বিস্তার লাভ করুক যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জ্যোতি, যা আল্লাহ্ তা'লারই নূরের প্রতিফলন। আর জগদ্বাসী তাঁর পতাকাতলে সমবেত হয়ে তৌহিদ বা একত্ববাদের জয়জয়কার অবলোকনকারী হোক। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই সৌভাগ্য দিন।

আজও একটি শোক সংবাদ আছে। জুমুআর পরে গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো, ইনশাআল্লাহ্। মোকাররম মুহাম্মদ ওসমান বাট সাহেবের সুযোগ্য পুত্র ফয়সালাবাদ নিবাসী এক আহমদী ভাই নাসিম আহমদ বাট সাহেবকে গত দু'তিন দিন পূর্বে ফয়সালাবাদে শহীদ করা হয়েছে।

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তাঁর দাদা গোলাম মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে তাদের বংশে আহমদীয়াত প্রবেশ করে। তিনি খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর যুগে বয়'আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। নাসিম আহমদ বাট সাহেব ১৯৫৭ সালে ফয়সালাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মগত আহমদী ছিলেন।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, রোজ রবিবার অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তি তাঁর বাড়ীর দেয়াল টপকে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

তিন ও চার সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে সে এসেছিল। তিনি বাহিরের আঙ্গিনায় ঘুমাচ্ছিলেন। তাকে উঠিয়ে– ঘুমন্ত অবস্থাতেই গুলি করে। দু'টি গুলি পেটে এবং আরেকটি কোমরে বিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর সকাল ৯টায় হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। গুলিবিদ্ধ হবার পর শাহাদতের পূর্বে তিনি নিজেকে সম্বরণ করেন, এবং স্ত্রীকে সাহস ও ধৈর্য ধরার উপদেশ দিতে থাকেন। তাঁর ছোট ভাই ওয়াসীম আহমদ বাট সাহেবকে ১৯৯৪ সালে এবং চাচাত ভাই নাসির আহমদ বাট সাহেব পিতা: আল্লাহ্ রাখ্‌খা সাহেব উভয়কে গত বছর শহীদ করা হয়। তখনও তিনি পরম ধৈর্য ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। শাহাদতের সময় জনাব নাসিম বাট সাহেবের বয়স ছিল ৫৪ বছর। তিনি একটি ফ্যাক্টরীতে কাজ করতেন।

তিনি সচ্চরিত্রবান, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সাহসী মানুষ ছিলেন। জামাতী কাজে অংশগ্রহণ করতেন। নিয়মিত জামাতের চাঁদা পরিশোধ করতেন। বায়তুয যিক্‌র মসজিদ– ঘর থেকে কিছুটা দূরে হওয়া সত্ত্বেও জুমুআর নামায নিয়মিত মসজিদে গিয়ে পড়তেন। নেযামে জামাত ও খিলাফতের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। সহজ সরল সাদাসিধে মানুষ ছিলেন।

স্ত্রী-সন্তানদের প্রতি একান্ত ভালবাসাপূর্ণ ও স্নেহসূলভ ব্যবহার করতেন। তিনি সৃষ্টির প্রতি সহমর্মী ও গরীব দরদী ছিলেন।

তিনি তাঁর স্ত্রী আসিয়া নাসিম সাহেবা ছাড়াও চার মেয়ে ও একজন পুত্র রেখে গেছেন। সানদাস নাজ সাহেবা তিনি বিবাহিতা, তাঁর স্বামীর নাম হলো গোলাম আব্বাস সাহেব। যার আনোয়ার সাহেবা তিনিও বিবাহিতা। সারা কওসার সাহেবা, তিনিও বিবাহিতা। শমায়েলা কমল এর বয়স পনের বছর। সে নবম শ্রেণীতে পড়ছে। আর ছেলে স্নেহের সাফির রমযান এর বয়স এগার বছর, সে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ছে। তাঁর এক ছেলে গত বছর অসুস্থতার কারণে বাইশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছে । আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন, আর তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে ধৈর্য দিন। জুমুআর নামাযের পর তাঁর গায়েবানা জানাযার নামায পড়াবো।

সানী খুতবার পর হুযূর (আই.) বলেন,

শাহাদতের এই ঘটনার দু'দিন পর ফয়সালাবাদে আমাদের জামাতের সেক্রেটারী উমুরে আমাকে লক্ষ্য করেও গুলি করা হয়। তাঁর শরীরে চারটি গুলি বিদ্ধ হয়। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। গতকাল পর্যন্ত তাঁর অবস্থাও খুবই আশংকাজনক ছিল। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এখন অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে। তাঁর জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে দ্রুত পূর্ণ আরোগ্য দান করুন। তাঁর পাকস্থলী মারাত্তকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, অপারেশন করা হয়েছে। তাঁর পেট, ঘাড় ও বাহুতে গুলি লেগেছে।

একইভাবে গতকালও লাহোরে একজন আহমদীর গাড়ির গতি রোধ করে গুলি করার চেষ্টা করা হয়। একটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং অপর গুলিটি চালাতে ব্যর্থ হয়। মোটকথা, বিরোধিতা খুবই বেড়ে গেছে। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের হিফাযত করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)
[পূণর্মুদ্রিত]

ধর্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করুন

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

অনুবাদ : আর তোমাদের মাঝে এমন এক দল থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। আর এরাই সফল হবে। (সূরা আলে 'ইমরান : ১০৫)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন :

আমার জামা'তকে উদ্দেশ্য করে জরুরী এ উপদেশ দান করা এবং তাদের নিকট আমার এ কথা পৌঁছে দেয়া আমার অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি; এরপর প্রত্যেকের অধিকার রয়েছে, তারা এ কথা মান্য করবে, কী করবে না। কেউ যদি মুক্তি (নাজাত) কামনা করে এবং পবিত্র জীবন, চিরস্থায়ী জীবন পেতে চায়, তবে সে যেন নিজ জীবন উৎসর্গ করে, সকল প্রকার চেষ্টা চালায়, চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে যে, কিভাবে সে এ মর্যাদা লাভ করবে–যেন সে বলতে পারে, 'আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার সকল কুরবানী, আমার নামাযগুলো কেবল মাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৭০)

কাদিয়ানে প্রতিষ্ঠিত তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন :

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, ধর্মের সেবার জন্য মানুষ গড়ে তোলা। এটা আল্লাহ্‌র বিধান যে, প্রথমে যারা এসেছে তারা চলেও যাবে আগে, পরবর্তিতে যারা আসবে তারা পূর্ববর্তীদের উত্তরাধিকারী হবে। পরবর্তিতে যারা আসে তারা যদি পূর্ববর্তীদের উত্তরাধিকারী না হয় তবে জাতি ধ্বংশের দিকে যাত্রা আরম্ভ করে। মৌলভী আব্দুল করিম শিয়ালকোটি এবং অন্য যারা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের স্থলাভিষিক্ত কেউ হয়নি। অপরদিকে এই মাদ্রাসার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, তাহলে লাভটা কী হল? যারা পাশ করে বের হচ্ছে যারা, ইহজাগতিক চিন্তায় তারা মেতে থাকছে। আসল উদ্দেশ্য অর্জন হচ্ছে না, আমি জানি এ অবস্থার পরিবর্তন যদি না হয় তাহলে কাজের কাজ কিছু হবে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এই বক্তব্যের ভিত্তিতে হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (পরবর্তীতে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল) অন্যান্য বুযুর্গগণের পরামর্শে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুমতি নিয়ে মাদ্রাসা আহমদীয়ার (পরবর্তীতে জামেয়া আহমদীয়া) ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন :

এই মাদ্রাসা কাদিয়ান যদি প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে অনেক বরকতের (কল্যাণের) কারণ হবে। এর দ্বারা আধুনিক শিক্ষিত একটি বাহিনী আমাদের হাতে আসতে পারে।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়ন; রূহানী খাযায়েন ২০তম খন্ড, ৭৫ পৃ:)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইন্তেকালের পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বয়আত গ্রহণের পূর্বে প্রথমেই বলেছিলেন :

"মাদ্রাসা দীনিয়াত অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আমার নির্দেশমত চালাতে হবে।" (বদর পত্রিকা, কাদিয়ান ২ জুন ১৯০৮)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন :

মাদ্রাসা আহমদীয়া তোমাদের আমলী জদ্দো জেহাদের (ধর্ম-সাধনার বাস্তবসম্মত সংগ্রামের) কেন্দ্রবিন্দু হবে। এর সাফল্যের উপর নির্ভর করবে যে ভবিষ্যতে জামা'তের তবলীগের প্রোগ্রাম সচল থাকবে কি না।" (আল ফযল, ১২ জুলাই ১৯২০ইং)

১৯২৮ইং সনে পূর্ণাঙ্গ জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী ভাষণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন :

"বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ এই সম্মান দান করেছেন, এতে আমাদের গর্ব করা উচিৎ যে, তেরশ' বছর পরে উপরোক্ত আয়াতের আলোকে কার্যক্রম হাতে নিতে আমাদেরকে তিনি এ সুযোগ ও শক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের মহান প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশ ও হেদায়াতের অধীনে মাদ্রাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেন এখান থেকে এমন জনশক্তি তথা এমন একটি দল তৈয়ার হয় ***যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভাল কথা শিক্ষা দিবে।*** (সূরা আলে ইমরান : ১০৫) এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে।" (আল ফযল, ১৪ আগষ্ট ১৯২৮ইং, আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খন্ড, পৃ: ২১৩)

হুযূর (রা.) আরো বলেন :

জামা'তের দাওয়াত ও তবলীগের জন্য এমন একটি দল তৈয়ার হতে থাকবে সর্বদা যারা জামা'তের দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজ চালিয়ে যাবার যোগ্যতা রাখবে।

হুযূর (রা.) আরো বলেন :

আমি তাহরীক (জোরালো আবেদন) করতে চাই, রাজনৈতিকভাবে সম্মানিত জাতি বলে যাদেরকে মনে করা হয় তাদের লোকেরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে ধর্মের সেবার জন্য উৎসর্গ করে থাকেন.....কাজের পরিধি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা দেখে মনে হচ্ছে যে, প্রতি বছর একশ' জন নয় বরং দুইশ'জন ওয়াকফে যিন্দেগী 'মুরব্বী' হয়ে বের হয়ে আসা উচিৎ।

অতএব, আমি জামা'তকে তাহরীক করছি

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেনঃ

"আমি তাহরীক (জোরালো আবেদন) করতে চাই, রাজনৈতিকভাবে সম্মানিত জাতি বলে যাদেরকে মনে করা হয় তাদের লোকেরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে ধর্মের সেবার জন্য উৎসর্গ করে থাকেন.....কাজের পরিধি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা দেখে মনে হচ্ছে যে, প্রতি বছর একশ' জন নয় বরং দুইশ'জন ওয়াকফে যিন্দেগী 'মুরব্বী' হয়ে বের হয়ে আসা উচিৎ।

অতএব, আমি জামা'তকে তাহরীক করছি যে, আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে জামেয়া আহমদীয়ায় প্রেরণ করবেন যেন তারা ধর্মের সেবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।"

যে, আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে জামেয়া আহমদীয়ায় প্রেরণ করবেন যেন তারা ধর্মের সেবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।" (আল ফযল, রাবওয়া ১৪ এপ্রিল, ২০১১ইং)

যারা ওয়াকফ (জীবন উৎসর্গ) করবেন তাদের উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন :

খোদা তাআলা আপনাদের জন্য বড় বড় সম্মান রেখেছেন। তোমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখ এবং আল্লাহ্‌র ধর্মের প্রচারের জন্য নিজেদের উৎসর্গ কর। তিনি যখন দেয়ার জন্য আসেন তখন তিনি এত কিছু দিয়ে দেন যে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়।" (আল ফযল রাবওয়া, ১৪ এপ্রিল ২০১১ইং শেষ পৃষ্ঠা)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) বলেন :

যাই হোক, জামেয়া আহমদীয়ার জন্য বিরাট অংকের টাকা খরচ হয়। ম্যাট্রিক পাশ ছাত্র ভর্তি করা হয়। তারপর পড়ানো হয়। যেমন প্রত্যেক তরতাজা জীবন্ত গাছের কিছু শাখা শুকে ঝরে পড়ে। অনুরূপভাবে যারা 'শাহেদ' ডিগ্রী লাভ করে তাদেরও কোন কোনটাকে কেটে ফেলা হয়। প্রতি বছর ছাঁটাই করতে হয়। ফল অনেক কম হয়–খরচ করতে হয় অনেক।

আমাদের টাকার সংকুলান অনেক কম থাকলেও মুরব্বীগণ যাদের আমরা প্রস্তুত করেছিলাম এদের প্রত্যেকের জন্য বিপুল পরিমাণ খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু তবুও প্রয়োজনের দিক থেকে এটা বড় গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য এ খরচ অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে।" (খুতবাতে নাসের : ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৪-৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন :

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ছাত্রদের (জামেয়ার) বক্তৃতা প্রদান ও লেখনী শক্তির যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করুন এবং তাদের জাগতিক ও রূহানী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন। ভবিষ্যতে উত্তম কর্মিবাহিনী প্রমাণিত করুন। আমাদের পক্ষ থেকে ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দকে অনেক অনেক মুহাব্বত ভরা সালাম।"

(জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার প্রিন্সিপালের নামে চিঠি, তারিখ ৯ জুন, ১৯৯৮ইং জামেয়ার মুয়েসীকা, খিলাফত জুবিলী সংখ্যা)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কাদিয়ানের জামেয়ার শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৩ জানুয়ারী ২০০৬ইং যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেখানে বলেছিলেন:

"ওয়াকফে যিন্দেগী মুরব্বীগণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেন না, যুগ খলীফার প্রতিনিধিত্ব করেন।'

(শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলী স্মরণীকা জামেয়া রাবওয়া পৃ: ৫১)

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) জামেয়ার প্রিন্সিপালের নামে লিখিত পত্রে নসীহত করে থাকেন। দোয়াও করেন। যেমন ৫ এপ্রিল ২০১১ইং তারিখে লিখিত পত্রে হুযূর (আই.) লিখেছেন :

"আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে এবং সকল শিক্ষকবৃন্দকে নিজ নিজ কর্তব্যসমূহ উত্তমরূপে পালনের তৌফিক দান করুন এবং নিজ ফযল নাযেল করুন।"

১৮ এপ্রিল ২০১১ইং তারিখে লিখিত পত্রে হুযূর (আই.) লিখেছেন :

আল্লাহ্ তাআলা জামেয়ার ছাত্রদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করুন, নিজ কৃপা বর্ষণ করুন। আল্লাহ্ তাআলা আপনার সাথী হোন এবং আপনাকে উত্তমভাবে কর্তব্যসমূহ পালনের তৌফিক দান করুন, (আমীন)।

অনুরূপভাবে হুযূর (আই.) সব সময় আমাদের জন্য বিশেষ দোয়া করেন। সব সময় হুযূর (আই.) জামেয়ার উন্নতি ও অগ্রগতির সকল দিকে কৃপাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। আমাদের সকলের বিশ্বাস হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) হামেশা মুরব্বী-মোয়াল্লেম অর্থাৎ যারা জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন তাদের জন্য এবং যারা জামা'তের কাজে সময় দেন তাদের জন্য বিশেষ দোয়া করেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-কে সুস্বাস্থ্য ও খাস হেফাযতে রাখুন–দীর্ঘজীবি করুন। আমাদের তরফ থেকে হুযূর হামেশা সুসংবাদ লাভ করুন। আমীন।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ভর্তির জন্য স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ, নিষ্ঠাবান, ছাত্রের প্রয়োজন। বিশেষ করে যারা ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত আছেন তারা এগিয়ে আসুন। আল্লাহ্ তাআলা সকলকে হেদায়াত দান করে কল্যাণমন্ডিত করুন।

ইসলামের ইতিহাস

মূলঃ ড. আব্দুস সালাম
ভাষান্তরঃ সিকদার তাহের আহমদ

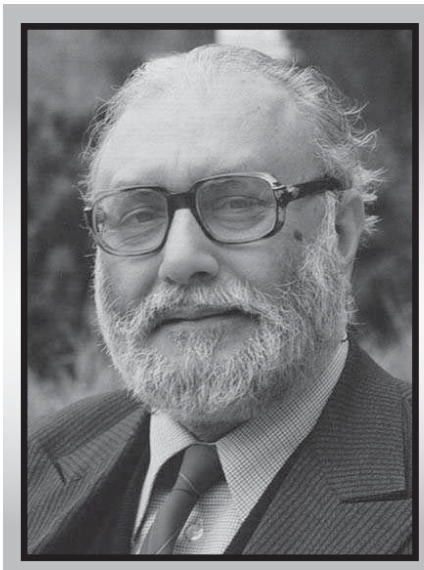

ড. আব্দুস সালাম

(২য় ও শেষ কিস্তি)

মঙ্গোলীয় শাসন

চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ার যাযাবর উপজাতিগুলো একত্রিত হয়। তারা ঝাঁক বেঁধে ইওরোপ ও এশিয়া আক্রমণ করে এবং সভ্য দুনিয়ার পুরোটা দখল করে নেয়। তাদের আক্রমণকে তুলনা করা চলে হিমপ্রপাত কিংবা তুষারধ্বসের সঙ্গে, যা সম্মুখবর্তী সমস্ত কিছুই নিশ্চিহ্ন করে দেয়। আনুমানিক ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতা একেবারেই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। মঙ্গোলীয়রা বাগদাদ নগরী ধূলিসাৎ করে দেয়। ইরান, ট্রান্সওক্সেনিয়া[১], ইরাক এবং বিভিন্ন ইসলামী ভূখণ্ড থেকে তারা খেলাফত মুছে ফেলে। কিন্তু, তখন আবারো একটি অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়। বিজিত জাতির ধর্ম [ইসলাম] বিজয়ীদেরকে [মঙ্গোলদেরকে] জয় করে ফেলে। [অর্থাৎ মঙ্গোলীয়রা ইসলাম গ্রহণ করে।]

মঙ্গোলীয়দের এরকম উত্থানের কারণ সম্পর্কে চূড়ান্ত ও সুনিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না। এদের আকস্মিকতা, এদের ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক আচরণ, এদের ত্রাস সৃষ্টিকারী উন্মত্ততা, এদের ধৈর্যহীন এবং উদ্দেশ্য বিহীন নির্মমতা, এদের অপ্রতিহত, যদিও স্বল্প-স্থায়ী, সহিংসতা দেখে বলা যায়: মঙ্গোলীয় যুগকে মানবেতিহাসের ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা বলার চেয়ে একে তুলনা করা উচিত অন্ধ প্রাকৃতিক কোনো শক্তির সঙ্গে, যা পরিবর্তনের সূচনা করে অত্যন্ত আকস্মিক ও প্রচণ্ডভাবে। আনুমানিক ১২২০ সালের দিকে তারা ইসলামী ভূখণ্ডে এবং ইউরোপের উপর চড়াও হয়। ইওরোপের মস্কো, রুস্তভ, কিয়েভ এবং ক্রাকোতে[২] তারা নির্মমভাবে লুণ্ঠন চালায়। তাদের দ্বিতীয় আক্রমণ পরিচালিত হয় ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে হালাকু খানের নেতৃত্বে। তখন তারা বাগদাদ নগরী এবং ইসলামী খেলাফত ধ্বংস করে দেয়। তাদের আচরণ দেখে এটা মনে হয় যে, তারা সেখানে গিয়েছিল শুধুমাত্র হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করতে এবং ধ্বংসসাধন করতে। একের পর এক সকল মুসলিম দেশ তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে ধরাশয়ী হয়। আত্মসমর্পণকারী কোনো শহরের অধিবাসীদেরকে তারা শুধুমাত্র তখনই রেহাই দিত, যখন তারা সেই অধিবাসীদের কর্ম-দক্ষতা থেকে লাভবান হতো, কিংবা যদি তাদেরকে তাদের নিজেদের দেশের লোকদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো যেত। দুর্দশাগ্রস্ত শত শত বন্দীকে মঙ্গোলীয়রা নিজেদের সেনাদলের সঙ্গে অভিযানে নিয়ে যেত। কোনো শহর অবরোধকালে তারা বন্দীদেরকে দিয়ে তাবু খাঁটাতো, তাদেরকে সামনে ঢাল হিসেবে রেখে নগর-দেয়ালের দিকে অগ্রসর হতো মঙ্গোলীয় সৈনিকরা। এই বন্দীদের দিয়েই খাদ ও পরিখাগুলো ভরাট করা হতো, যেন সৈনিকরা সেগুলো অতিক্রম করে যেতে পারে। এতো কিছুর পরও যদি কোনো বন্দী বেঁচে থাকতো, তখন অবধারিতভাবেই তলোয়ার চালিয়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করা হতো। এরপর যথারীতি অন্য কোনো বিজিত অঞ্চল থেকে বন্দীদের নতুন দল নিয়ে আসা হতো।

শত্রুদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার পর যখন তারা পরবর্তী লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হতো, তাদের আগমন-বার্তা শুনে সেখানকার লোকজন আতঙ্কে স্থবির হয়ে পড়তো- এমনই ছিল তাদের নৃশংসতা। তাদের দ্বারা সৃষ্ট ত্রাসের মাত্রা নিরূপণ করা যায় ইবন আল আসির-এর একটি উদ্ধৃতি থেকে। (১২৩০ খ্রিস্টাব্দে লিখিত):

"আমি শুনেছি যে, তাদের মধ্য থেকে একজন [তাতার সৈনিক] এক ব্যক্তিকে বন্দী করলো। কিন্তু, বন্দীকে হত্যা করার মতো কোনো অস্ত্র তার কাছে ছিল না। তাই, সে তার বন্দীকে বলল, মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে শুয়ে থাক, নড়াচড়া করবি না। বন্দী ব্যক্তি তদ্রূপই করলো। তখন সেই তাতার চলে গেল এবং তার তলোয়ার নিয়ে ফিরে এল এবং বন্দীকে হত্যা করলো।"

তারা কোনো ধর্মের অনুসারী ছিল না। কিন্তু, ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করায় তারা পোপের সন্তোষ লাভ করে। পোপ এতোটাই খুশি হয়েছিল যে, ওগতাই খান[৩] ও অন্য মঙ্গোলদেরকে নিজ স্বাক্ষর সম্বলিত বেশ কয়েকটি চিঠিও প্রেরণ করেছিল। পোপ তাদের বিশ্বাসঘাতকতা তখনই বুঝতে পেরেছে যখন তাদের বিভিন্ন দল কোনো ধরনের আনুকূল্য প্রদর্শন না করে, সেই একইভাবে খ্রিস্টান ভূখণ্ডগুলোতেও ধ্বংসাত্মক অভিযান পরিচালনা করেছিল।

১) এখনকার উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কিরগিজিস্তানের দক্ষিণ অংশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কাজাকস্তান নিয়ে গঠিত মধ্য-এশিয়ার কিছু অংশকে প্রাচীনকালে ট্রান্স-অক্সেনিয়া নামে অভিহিত করা হতো। ভৌগোলিকভাবে আমু দরিয়া এবং সির দরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চল এটি। -অনুবাদক।

২) Cracow- পোলান্ডের একটি শহর। -অনুবাদক।

৩) Ogtai Khan- চেঙ্গিস খানের তৃতীয় ছেলে। ওগতাই খানের বড় দু'ভাই হলো জচি এবং চুঘতাই খান এবং সবচেয়ে ছোট ভাই হলো তৌল। চেঙ্গিস খানকে বলা হয় 'গ্রেট খান' এবং ওগতাই খানকে বলা হয় 'দ্বিতীয় গ্রেট খান'। -অনুবাদক।

ইসলামী নগরী বাগদাদ তারা পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করে। খলিফাকে হত্যা করার মাধ্যমে তারা ইসলামী দুনিয়ায় বিভিন্ন মুসলিম জাতির মধ্যে যে-ঐক্যের ছায়ামাত্র অবশিষ্ট ছিল, তার প্রতি প্রচণ্ড আঘাত হানে। বাগদাদে সপ্তাহ জুড়ে যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় তাতে আশি হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে।

মুসলিম শহরগুলোর অবর্ণনীয় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। যার ফলে সেগুলো আর কখনোই পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে পারে নি। মঙ্গোলরা হাজার হাজার বই-পুস্তকই শুধু ধ্বংস করে নি, তারা বিদ্যাচর্চার ঐতিহ্যও মিটিয়ে দিয়েছিল। এতোকিছুর পরও তারা ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করতে সমর্থ হয় নি; বরং তারা এর শিকারে পরিণত হয়েছিল। ১২৭৫ খ্রিস্টাব্দে মঙ্গোল শাসকগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তারপর সেই মঙ্গোলরাই পরিণত হয় ইসলামের অন্যতম সেবকে।

পরবর্তী দুইশ' বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে দেখা যায়, মঙ্গোলীয় মুসলমান শাহযাদাগণ পারস্যে প্রায় ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছেন। একইসময়ে উসমানীয় তুর্কিগণ এশিয়া মাইনরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। আর, সালাহউদ্দিনের বংশধরেরা মিশর শাসন করেছেন। ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দের পর মধ্য-এশিয়ায় আরেক বিজয়ী বীর তৈমুর লঙের উত্থান ঘটে। তিনি অবশ্য ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে, বিশ্বজয় ও আধিপত্য বিস্তার ছাড়া তার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। চেঙ্গিস খানের মতোই তিনি পারস্য, ভারত, আফগানিস্তান, রাশিয়ার কিছু অংশ এবং চীনের কিছু অংশ জয় করেন। ১৪০২ খ্রিস্টাব্দে তুরস্কের সুলতান প্রথম বায়োজিদকে তিনি পরাজিত করেন। এটিই তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিজয়। এর ফলে উসমানীয় তুর্কিদের অগ্রযাত্রা ক্ষণিকের জন্য ব্যাহত হলেও তা ক্ষণস্থায়ী ছিল। তৈমুর লঙের উত্তরসূরীগণ প্রায় একশ' বছর সময়কাল মধ্য-এশিয়া এবং পারস্য শাসন করে। এরপর তাদের স্থান দখল করে সাফাভিগণ।

ক্ষণিকের বিরতি নিয়ে এই অন্ধকার যুগের ইসলামী ভাবধারা যাচাই বা সমীক্ষা করাটা এখন অপ্রাসঙ্গিক কিংবা অসমীচীন হবে না।

এই সময়কালের কয়েকজন মহান সুফীর কথা উল্লেখ করা যায়। এদের মধ্যে প্রথম হলেন শাহ শামস তিবরিজ। তার শিষ্য মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমি ১২৬০ খ্রিস্টাব্দে 'মসনবি' লিখেন। এ সম্পর্কে তিনি এই মসনবিতেই লিখেন যে, "এটি হলো ধর্মের শিকড়েরও শিকড় আর পুনরায় সম্পর্ক স্থাপনের মতো রহস্যময় বিষয়টির আবিষ্কার এবং জ্ঞান।"

ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল সুফী আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। আন্দালুসিয়ার অধিবাসী, ইসলামের মধ্যযুগের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, শেখ মুহিউদ্দিন ইবন-আল আরাবী দামেশ্‌কে গমন করেন এবং ১২৪০ খ্রিস্টাব্দে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন।

এই যুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাদী এবং হাফিজের নাম উল্লেখ করা যায়।

সাফাভী এবং উসমানীয় তুর্কিগণ

এখন আমাদের ইতিহাসের চতুর্থ পর্যায় শুরু করছি। এটি শুরু হয় ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে যখন শাহ ইসমাইল সাফাভী ইরানে ক্ষমতা দখল করেন এবং সাফাভী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন। ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসের উপর এই ঘটনার সবিশেষ প্রভাব ছিল।

ইসলামী দুনিয়া তখন পরস্পরের বিরুদ্ধে ক্রিয়াশীল দুটি বিরোধী শিবিরে বিভক্ত ছিল। একদিকে ছিল শিয়া-শাসিত ইরান, আফগানিস্তানের কিছু অংশ, ইরাক এবং তুরস্ক, ইরাকের কিছু অংশ, আরব, সিরিয়া, মিশর এবং আলজিয়ার্সের সমন্বয়ে গঠিত উসমানীয় তুর্কি সাম্রাজ্য। স্পেন তখন মুসলমানদের হাত থেকে বেরিয়ে গেছে। আর ভারত শাসন করছিল তৈমুর লঙের বংশধর প্রতাপশালী মুঘোলরা।

মুসলিম ভূখণ্ডগুলোতে ১৫০০ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নিম্নলিখিত নিরঙ্কুশ একনায়কতন্ত্র ছিল: ভারতে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের মতো চরম ক্ষমতাধর মুঘোল শাসকগণ; ইরানে শাহ আব্বাসের ন্যায় সাফাভী শাসকগণ; তুরস্কে মোহাম্মদ (দ্বিতীয়), সেলিম (প্রথম) এবং মহান সুলায়মান। মুঘোল আমলে ভারত অনেক ক্ষমতাশালী দেশ ছিল। পারস্যের সমৃদ্ধ তথা স্বর্ণযুগ ছিল সেটিই এবং তুর্কিরা সে-সময়েই অনেক বড় সাম্রাজ্য শাসন করছিল যা তারা ইতোপূর্বে কখনোই করে নি।

এভাবে সেলিম (প্রথম) যখন মিশর, সিরিয়া এবং হেজাজ জয় করলেন এবং খলিফা উপাধি গ্রহণ করলেন, তখন মহান সুলায়মান (শাসনকাল ১৫১০-১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দ) বেলগ্রেড এবং পোলান্ডের কিছু অংশ জয় করেন। তুরস্কের যখন বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নৌবহর ছিল তখন তারা ভিয়েনা অবরোধ করেছিল। তুর্কি সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল জার্মেনির সীমান্ত থেকে পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত। যদিও এই যুগে ইসলামী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল; তথাপি রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলিম বিশ্ব উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে উপনীত হয়েছিল। সমসাময়িক একজন ইউরোপীয় ইতিহাসবিদ লিখেছেন: 'ইউরোপে আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে পারস্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ ব্যতীত তুর্কিদেরকে আর কোনো কিছুই বিরত রাখতে পারতো না।'

এই যুগ নিয়ে আমি বিশদভাবে আলোচনা করবো না। তবে, ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর রূপরেখা বর্ণনা করবো।

১৭০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী কাল

প্রায় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপে তুর্কিদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ন ছিল। কিন্তু, ভারতে মুঘোল সাম্রাজ্য নানা অংশে বিভক্ত হচ্ছিল এবং পরবর্তী দুইশ' বছরে বৃটিশরা ধীরে ধীরে তাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পারস্যে সাফাভীগণ তাদের কর্তৃত্ব হারায় এবং ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে আফগানরা পারস্য দখল করে। আফগানরা সুন্নি ছিল এবং তারা শিয়া মতাবলম্বী পার্সীদেরকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতো। সুলতান মাহমুদের পর (১০০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে) প্রথমবারের মতো আফগানরা স্বাধীন শক্তি হিসেবে ঘোষণা করতে পারলো। যাহোক, অচিরেই তারা নাদির শাহের দ্বারা পারস্য থেকে বিতাড়িত হলো। নাদির শাহ খুব যেনতেনভাবে শুরু করলেও অবশেষে ক্ষমতা অর্জনে সমর্থ হয় এবং পারস্য শাসন করে। তার বিজয়-ইতিহাস তৈমুর কিংবা নেপোলিয়নের মতোই আশ্চর্যজনক ছিল।

পার্সী ইতিহাস বর্ণনার শেষ ভাগ হিসেবে বলা যায়, নাদির শাহের পর তার পরিবার ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং কাজারগণ (Qajars) তাদের স্থান দখল করে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের বিপ্লব পর্যন্ত তারা কার্যকরভাবে পারস্য শাসন করেছে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে পার্সীরা তাদের সংবিধান লাভ করে। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে রেজা শাহ পাহলবী কাজারদেরকে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে। আপনারা সবাই জানেন, রেজা শাহ পাহলবী তার ছেলের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করেন। বর্তমানে শাহ হিসেবে তার ছেলেই ইরান শাসন করছেন।[৪]

৪ এটি ১৯৪৭ সালের কথা -অনুবাদক।

তুর্কিদের ইতিহাস সম্পর্কে বলতে হয়, ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের পর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে রাশিয়ার উত্থান। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শুরুতে তুর্কি সেনাদল বিজয়ী হচ্ছিল। ১৭১০ খ্রিস্টাব্দে পিটার দি গ্রেটের সেনাবাহিনী সামগ্রিক ধ্বংসের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে তুর্কিদের ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিতে থাকে। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে ক্রিমিয়া তুর্কিদের হাতছাড়া হয়ে যায় এবং স্বাধীনতা লাভ করে। তুরস্কের ঐতিহ্যবাহী মিত্র ছিল ফ্রান্স। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে নেপোলিয়ন যখন মিশর দখল করেন তখন ফ্রান্স তুরস্কের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করে। মোহাম্মদ আলীর অধীনে মিশর তুর্কি বলয় পরিত্যাগ করে এবং আধা-স্বাধীনতা লাভ করে। মিশরের পরবর্তী কালের ইতিহাস এবং তাতে গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকার কথা আপনাদের জানা আছে। তাই আমি বিস্তারিত বর্ণনায় আর যাচ্ছি না।

প্রায় একই সময়ে ফরাসীরা তুরস্কের কাছ থেকে আলজিয়ার্স কেড়ে নেয়। ইউরোপীয় শক্তিসমূহের সহায়তায় ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে গ্রিকরা তাদের স্বাধীনতা অর্জন করে। তুর্কি খেলাফতের পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যেতে থাকে এবং তরুণ তুর্কিরা ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে খলিফার হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের [প্রথম বিশ্ব-] যুদ্ধে জার্মানীর পক্ষাবলম্বন করায় ইউরোপ এবং এশিয়ার যাবতীয় অধিকার হারায় তুরস্ক। এই যুদ্ধের পর আরবের বিভিন্ন দেশ তাদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

১৯৪৭ সালের পরিস্থিতি

শেষ করার আগে আমি একে একে সবগুলো মুসলিম দেশ সম্পর্কে মন্তব্য করবো এবং এই দেশগুলোর জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ইতিহাসের সারকথা বর্ণনা করবো। পূর্বাঞ্চল থেকেই শুরু করছি।

পাকিস্তান

মুসলমানরা অষ্টম শতকে সিন্ধু এবং মুলতানে আগমন করে। যাহোক, উপমহাদেশে মুসলমানদের শাসন শুরু হয় বারো শতকে। বিভিন্ন আফগান রাজবংশ দ্বারা ৪০০ বছর শাসিত হয়েছে ভারত। এরপর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘোলরা তাদের স্থান দখল করে। এর ২০০ (দুইশ') বছর পর মুঘোলদের ক্ষমতা চলে যায় বৃটিশদের হাতে। আর, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বৃটিশরা চলে যায় এবং পাকিস্তান জন্ম লাভ করে।

আফগানিস্তান

উমাইয়া এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল আফগানিস্তান। ১০০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আলাদা দেশ হিসেবে এটি অস্তিত্ব লাভ করে। তখন গজনভী রাজবংশ আফগানিস্তান শাসন করছিল। তাদের রাজধানী ছিল গজনীতে। এরপর, আফগানিস্তানের ভাগ্য পারস্যের ভাগ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। এই ইতিহাস ভাগ্যের বিচিত্র উত্থান-পতনের ইতিহাস। আফগানিস্তান একটি প্রদেশের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। কখনো এটি মুসলিম ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশ ছিল, কখনো বা এটি পারস্যের প্রদেশ ছিল।

যাহোক, ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। উনিশ শতকে বৃটিশদের সঙ্গে আফগানদের বিরোধ হয়। কিন্তু, আফগানিস্তান বিজয়ের ক্ষেত্রে বৃটিশরা কখনোই কোনো সুবিধা করতে পারে নি। তখন থেকে এটি স্বাধীন শক্তি হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

পারস্য (ইরান)

উমাইয়া এবং আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের অংশ ছিল পারস্য (ইরান)। এগার এবং বারো শতকে এটি সেলজুক শাসনের অধীনে ছিল। প্রায় ১০০ (একশ') বছর ধরে মঙ্গোল শাহজাদাগণ পারস্য শাসন করেছে; ১৩৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তৈমুর, এবং তার বংশধরগণ শাসন করেছে। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সাফাভীগণ এবং এদের পরে উনিশ শতকে কাজারগণ পারস্য শাসন করেছে।

মধ্য এশিয়া

আঠার শতকে যখন রাশিয়ানরা ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হচ্ছিল তখন পর্যন্ত পারস্যের অংশ ছিল ট্রান্স-অক্সেনিয়া। রাশিয়া উনিশ শতকে বোখারা ও সমরকন্দ জয় করে।

ইরাক ও সিরিয়া

১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিরিয়া এবং আরবের ভাগ্য পারস্যের সঙ্গে জড়িত ছিল। (ফিলিস্তিন তখন সিরিয়ার অংশ ছিল। বলা যায় মুসলিম ইতিহাসের পুরো সময় জুড়েই ফিলিস্তিন সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল।)। এরপর এগুলো তুর্কি সাম্রাজ্যের অংশে পরিণত হয়। এই জাতিগুলো ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের [প্রথম বিশ্ব-] যুদ্ধের সময়ে স্বাধীনতা লাভ করে। যুদ্ধের পর বৃটিশরা ইরাকের স্বাধীনতা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফরাসীরা সিরিয়াকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে এবং ইরাক ও ট্রান্স-জর্ডান ব্রিটিশদের আশ্রিত রাজ্যে (প্রটেক্টরেট-এ) পরিণত হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দের [দ্বিতীয় বিশ্ব-] যুদ্ধের পরেই সিরিয়া এবং ট্রান্স-জর্ডান স্বাধীনতা লাভ করে।

তুরস্ক

মুসলমানদের পক্ষ থেকে আব্বাসীয়গণ প্রথম তুরস্ক জয় করে। উসমানীয় তুর্কিরা ১২৮৮ খ্রিস্টাব্দে এটি গ্রহণ করে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মোহাম্মদ কনস্ট্যান্টিনোপল[৫] জয় করে। তুরস্ক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়; কিন্তু, উনিশ শতকে তাদের অবস্থা নিম্নগামী হতে থাকে। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের যুদ্ধে জার্মানীর সঙ্গে জোট বাঁধায় তুরস্ককে সবকিছু হারাতে হয়।

মিশর

উমাইয়ারা ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশর শাসন করেছে। এরপর ফাতেমীয়গণ ১১৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছে এবং তারপর ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মিশরে মামলুক শাসন ছিল। সেই সময়ে তুর্কি বল্কান সেলিম তুরস্ক দখল করে এবং একে তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। উনিশ শতকে এটি স্বাধীনতা লাভ করে এবং আবারো ব্রিটিশদের অধীনে চলে যায়। সম্প্রতি[৬] তুরস্ক স্বাধীনতা লাভ করেছে।

স্পেন

৭১০ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা স্পেন দখল করে। উমাইয়াগণ স্পেন শাসন করেছে। এই দেশটি কখনোই আব্বাসীয়দের বশ্যতা স্বীকার করে নি। এই আরবীয় মুসলিম শাসন-ক্ষমতা ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন মুসলমানরা স্পেন থেকে হয় বহিষ্কৃত হয়েছে কিংবা পুনরায় খ্রিস্টধর্মে ফিরে গেছে।

আমার এই চকিত পর্যালোচনায় মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়া কিংবা আফ্রিকা অন্তর্ভুক্ত করি নি।

আমি আগেই বলেছি ইসলামের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবনতি বা মন্দার সময়ে ইসলামের ধর্মীয় জীবনীশক্তি বার বার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ইসলামের রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতা নিম্নতম পর্যায়ে পতিত হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে; তখন ইসলামে আহমদীয়া আন্দোলনের সূচনা হয়। প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে কাদিয়ানে আবির্ভূত হন। তার মাধ্যমে ইসলাম আধ্যাত্মিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে পুনরুজ্জীবিত হবে, ইনশাআল্লাহ।

---

৫ বর্তমান ইস্তাম্বুল -অনুবাদক।
৬ ১৯৪৭ সালের কথা -অনুবাদক।

খেলাফত : বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যের একমাত্র পন্থা

মুহাম্মদ খলীলুর রহমান

(৬ষ্ঠ ও শেষ কিস্তি)

৭। বর্তমান যুগের সমস্যা-বিক্ষুব্ধ প্রেক্ষাপট: সমাধানের উপায়:

ক) সার্বিক পরিস্থিতি: (৫ম কিস্তিতে প্রকাশিত)

(খ) বহিরাগত আক্রমণ :

উল্লেখ্য যে, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইসলামের উপর বহিরাগত আক্রমণ চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। ত্রিত্ববাদী ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীব্যাপী ছলে-বলে-কৌশলে উপনিবেশবাদী নীতি অনুসরণ করে চলছিল, যার ফলে কালক্রমে এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলীয়ায় তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সেই সঙ্গে ত্রিত্ববাদী রাষ্ট্রশক্তির ছত্র-ছায়ায় খৃষ্টান-পাদ্রী ও প্রচারকগণ দলে দলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের সার্বিক-দুরবস্থার সুযোগে খৃষ্টান প্রচারকগণ ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচন্ডভাবে অপপ্রচার শুরু করে। এ সম্বন্ধে হযরত মির্যা সাহেব (আ.) বলেছেন–

"বাহিরের বিপদ লক্ষ্য কর! সকল সম্প্রদায়ই ইসলামের বিনাশ সাধানের জন্য সচেষ্ট আছে। বিশেষত: খৃষ্টান-সম্প্রদায় ইসলামের পরম শত্রু। মিশনারী ও পাদরীগণের যাবতীয় চেষ্টার লক্ষীভূত বিষয় মাত্র একটি, যে প্রকারেই হোক এবং যতদূর সম্ভব ইসলাকে নির্মূল করতে হবে এবং যে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম বহু জীবন উৎসর্গ করেছে, উহার বিনাশ সাধন করতে হবে এবং জগদ্বাসী যাতে যীশুকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করে ও তাঁর বিশ্বাসী হয়, রক্তদানে ব্যবস্থা করতে হবে। 'রক্তদান' বা প্রায়শ্চিত্তবাদ অসংযম, স্বেচ্ছাচার ও সে উচ্ছৃঙ্খলতার জন্মদাতা। উহার প্রচার করে পাদ্রীগণ খোদার ভয়, হৃদয়ের সূচীতাও জীবন নাশ করেছে। এইরূপে তারা ইসলামের মূল উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। খৃষ্টান-পাদ্রীগণ তাদের এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করে থাকে। দুঃখের সহিত বলতে হয়, তারা লক্ষাধিক মুসলমানকে খৃষ্টান করেছে।" (তবলীগে হক, পৃষ্ঠা ৭ প্রকাশ কাল ১৯৮৩ খৃ:)।

তৎকালীন খৃষ্টান পাদ্রীগণ দাবী করতে লাগলেন যে, অচিরেই ত্রিত্ববাদের চূড়ান্ত-বিজয় বিঘোষিত হবে এবং মুসলমানদের মূল-কেন্দ্র কা'বা শরীফেও তাদের বিজয়-কেতন উড্ডীন হবে। প্রখ্যাত খৃষ্টান নেতা জন হেনরী বারোজ কর্তৃক ১৮৯৬-৯৭ সনে প্রদত্ত ভাষণের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি হতেও বিষয়টি উপলব্ধি করা যেতে পারে :–

'I might sktech Christian movement in Mussalman Land which has touched with the radiance of the cross, the Lebanon and the persioan mountains as well as the waters of the Bosphorus and which is the sure harbinger of the day, when Cairo, Damascus and Teheran shall be the servents of Jesus and when even the solitudes of Arabia shall be pierced and Christ in the person of his disciples shall enter the Kaba of Mekka and the whole truth shall at last be there spoken.

(Lectures on Christianity The world wide Religion (1896-97) by John Henry Burrows. Page-42)

প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) ব্যতীত এই অবস্থার মোকাবেলা যথাযথভাবে করার মত ক্ষমতা করো ছিল না। হযরত মির্যা সাহেব ঐশী-সাহায্যে ইসলামের জীবন প্রদায়ী শক্তি, যুক্তি-জ্ঞান এবং ঐশী-নিদর্শনের আলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগের খন্ডন করেন, ইসলামের সত্যতার জীবন্ত-নিদর্শন পেশ করেন এবং অনুরূপ নিদর্শন পেশ করার জন্য ইসলাম-বিরোধী সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের পন্ডিত ও পাদ্রীদেরকে আহ্বান জানান। ফলত: তিনি এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাতের প্রতিনিধিদের সংগে যুক্তি, জ্ঞান এবং ঐশী-নিদর্শনের ভিত্তিতে মোকাবেলা করে অধ্যাবদি কেউ-ই টিকতে পারে নাই। সমকালীন নিরপেক্ষ পন্ডিত-সমাজ ও সূধী-মহল অকপটে তাঁর অবদান স্বীকার করত: বলেছেন :

আর্য সমাজী ও খৃষ্টানগণের মোকাবেলায় মির্যা সাহেব যে ইসলামী-খেদমত পেশ করেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। তিনি 'মোনাযেরা' তথা ধর্মীয় বাক-তর্কের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বদলিয়ে দিয়েছিলেন এবং হিন্দুস্থানে এক নতুন-সাহিত্যের বুনিয়াদ কায়েম করেছেন। একজন মুসলমান হিসাবে এবং গবেষণাকারীরূপে আমি স্বীকার করছি যে, কোন বড়ো হতে বড়ো আর্যসমাজী অথবা পাদ্রীর এ ক্ষমতা ছিল না যে, মির্যা সাহেবের মোকাবেলায় তারা মুখ খোলে।" (দিল্লী থেকে ১/৬/১৯০৮ইং প্রকাশিত 'কার্জন গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক)।

ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলায় মির্যা সাহেব যেরূপ বিজয়ী-জেনারেলের কর্তব্য সম্পাদন করেছেন, তাতে আমরা একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই মহান আন্দোলন, যা আমাদের শত্রুগণকে সুদীর্ঘকাল যাবৎ বিপর্যস্ত করে রেখেছিল, তা যেন ভবিষ্যতেও জারী থাকে।" (পাঞ্জাবের 'উকিল' পত্রিকার সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আজাদের অভিমত ১১/০/১৯০৮)।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে বিগত ১২৫ বছর যাবৎ আহমদীয়া আন্দোলন প্রধান্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পৃথিবীব্যাপী নিরবিচ্ছন্নভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে ২০২টি দেশে

আহমদীয়া জামাতের শাখাসমূহ হ'তে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এবং তাঁর স্থলাভিষিক্ত যুগ-খলীফা কর্তৃক প্রদর্শিত পন্থায় ইসলামের পুন:প্রতিষ্ঠা ও প্রচার কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

(গ) অভ্যন্তরীণ সংকট :

মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ অবস্থার কথাও মুক্ত চিত্তে বিশ্লেষণ করলে যে চিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তা খুবই দু:খজনক। কেননা, বিশ্বের প্রায় এক চতুর্থাংশ লোক মুসলিম বলে পরিচিত হওয়া সত্বেও তাদের মধ্যে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মত-পার্থক্য অত্যন্ত প্রবল। ধর্মীয়ভাবে মুসলমানগণ বিভিন্ন ফেরকা, দল এবং উপদলে বিভিক্ত (এ সম্বন্ধে তিরমিযী ও মেশকাত শরীফের ভবিষ্যদ্বাণীর অনুযায়ী মুসলমানগণ আখেরী-যুগে ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে বলে পূর্বে উদ্ধৃতি দিয়েছি)। দ্বিতীয়ত: রাজনৈতিকভাবে কলহ-কোন্দল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সশস্ত্র ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ অব্যাহত গতিতে চলছে। তৃতীয়ত: সত্যিকার ইসলামী-শিক্ষা এবং আদর্শের বাস্তব-অনুসরণের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা এবং সামগ্রিকতার অভাব সর্বত্র লক্ষণীয়। এই সকল অবস্থা সম্পর্কে বিগত একশত বছরের ইতিহাস এ কথার জ্বলন্ত সাক্ষ্য বহন করছে যে, সত্যিকার ইসলামী-শিক্ষা ও আদর্শের পুন:প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিম জনজীবনে প্রাণ সঞ্চারের জন্য হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর আবির্ভাব অত্যন্ত জরুরী ছিল। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলমানদের ধর্মীয় এবং নৈতিক-অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, সমকালীন সচেতন চিন্তবিদগণ এক বাক্যে এ কথা স্বীকার করেছেন।

সমকালীন মুসলিম সমাজের দুরাবস্থার সঠিক-চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে কবি কণ্ঠে : মুসলমানী দর কিতাব তা মুসলমানাঁ দর গোর" (সত্যিকার ইসলাম কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এবং সত্যিকার মুসলমানগণ কবরে চলে গেছেন)। কবি ইকবাল বলেছেন : "ইয়ে মুসলমাঁ হ্যায় জিনহেঁ দেখ কে সরমায়ে য়াহূদ" (এরূপ মুসলমানদের দেখে ইহুদীরাও লজ্জা পায় : (শিকওয়া ও যাওয়াবে শিকওয়া)।

খৃষ্টীয় ১৯১২ সালে প্রকাশিত একটি প্রসিদ্ধ পত্রিকার অভিমত লক্ষ্যনীয়: 'ইহা সত্য কথা যে, কুরআন করীম আমাদের মধ্য হতে একেবারে উঠে গেছে। আমরা কুরআন করীমের ওপর নামেমাত্র বিশ্বাস রাখি। কিন্তু মনে মনে ইহাকে অতি সাধারণ-গ্রন্থ বলে জানি। " ('আহলে হাদীস' পত্রিকা, ১৭/৬/১৯১২ইং)।

হিজরী ১৩০১ সালে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত পুস্তকে আল্লামা নবাব সিদ্দিক হাসান খানের পুত্র আল্লামা আবুল খায়ের নুরুল হাসান খান লিখেছেন : "এখন ইসলামের মাত্র নাম ও কুরআনের মাত্র অক্ষর অবশিষ্ট রয়েছে। মসজিদগুলো বাহ্যিকভাবে আবাদ হলেও একেবারে হেদায়াতশূন্য। এই উম্মতের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল জীব হতে নিকৃষ্টতম ("ইকতারাবুস সাআ'ত")।

"না দীন বাকী না ইসলাম বাকী/ফকত রহ গীয়া ইসলাম কা নাম বাকী" (ধর্মও অবশিষ্ট নাই, ইসলামও অবশিষ্ট নাই। কেবল ইসলামের নামটিই অবশিষ্ট রয়েছে : (মাওলানা আলতাফ হোসেন হালী প্রণীত 'মুসাদ্দেসে হালী' দ্রষ্টব্য)।

প্রসঙ্গত: কয়েক বছর আগে প্রকাশিত একটি দৈনিকের উপ-সম্পাদকীয় ভাষ্যের অংশবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"আমাদের একটা অহংকার, আমরা মুসলমান এবং বিশ্বের অপরাপর মুসলিম দেশের তুলনায় আমরা নাকি অধিকতর ধর্ম-পরায়ণ। কথাটা কী অর্থে বলা হয়, তা বিচার করলে দেখা যায়, ওরস, মাযার আর মিলাদ মাহফিল কিংবা ওয়াযের মজলিসে নিশ্চিতভাবেই এদেশের বেশীর ভাগ মানুষের ধর্মপরায়ণতার স্বাক্ষর মেলে। শবেবরাত, জুমআতুল বিদা, শবেকদররের মত পর্বে মসজিদগুলোতে জায়গা পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠে। ওদিকে কিন্তু দেশ জুড়ে রয়েছে দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ভিক্ষাবৃত্তি আর চুরি-চামারি। ভাল একজোড়া জুতা নিয়ে মসজিদে যান–নামাযের সালাম ফেরাতে না ফেরাতেই দেখবেন সেই জুতোজোড়া গায়েব। মসজিদ থেকে বেড় হলেই দেখা যাবে দুনিয়ার যত সব পঙ্গু, বিকালঙ্গ, আর্ত-আতুর, মিসকীন, ফকির-ফকিরনী আপনাকে ছেঁকে ধরেছে।

অথবা চারিদিকে এত ফাকিবাজ, কাজে কর্মে এত গাফিলতি, এত ঘুষ, এত দুর্নীতি এসব কারা করছে? এই শতকরা ৮৫ জন মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেশে যে অবাধে মিথ্যাচার চলে, চলে মানুষকে বঞ্চিত করার কায়-কারবার, অপরকে লাঞ্চিত করার পাঁয়তারা, বেঈমানী, মোনাফেকী, হত্যা, খুন, জখম, ধর্ষন, লুটতরাজ.--এইসবই বা কারা করছে? সীমান্ত জুড়ে চলছে চোরাচালানের মত অপকর্ম–এসবই বা কারা চালাচ্ছে? অনেকে হয়ত বলবেন, এর কারণ যতটা না ধর্মহীনতা, তার চাইতে অনেক বেশি অর্থনীতি তথা দারিদ্র। তাহলে মুখ ফেরান মধ্যপ্রাচ্যের দিকে, সেখানে তো এখন অঢেল বিত্ত-বেসাত। কিন্তু সেখানে কি দেখি? অলসতা, বিলাসিতা, আড়ম্বর আর অপচয়, অশিক্ষা ও মুর্খতার সাথে অঢেল বিত্ত-বেসাত মিলে যে পরিস্থিতি, তা মধ্যপ্রাচ্যের একশ্রেণীর মানুষকে যে কীভাবে উদ্ধত, অহংকারী ও বেপরোয়া বরে তুলেছে, অভিজ্ঞতা যাদের রয়েছে, কেবল তারাই তা উপলব্ধি করতে পারবেন। এদিকে কিন্তু প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে ধর্মের ভড়ং। ইরান-ইরাক যুদ্ধ বছরের পর বছর ভ্রাতৃঘাতী রক্তে মৃত্তিকা ষিক্ত করছে। উপরে কিন্তু ধর্মের ভড়ং ঠিকই রয়েছে। ছোট্ট দেশ ইসরাঈলের মারের চোটে গোটা আরবে একই অবস্থা। তারপরেও ইসলামের দোহাই দিয়ে চলছে অনৈক্য আর হানাহানি। সেই স্বৈরতা, সেই এক-নায়কত্ব, সেই বাদশাহী, সেই আমীর-শাহী ব্যবস্থা কোন না কোনভাবে, কোন না কোন মুসলিম দেশে চালু আছে। এইসব স্বৈরশাসকই সবচাইতে বেশী করে ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, উঠতে বসতে ইসলামের দোহাই পাড়ে। অনেককেই আবার ধর্মের নামে ফেতরা আর যাকাতের টাকাটা নিতে, অশিক্ষিত আর দরিদ্র মুরীদের উপার্জনের টাকাটা ভেট হিসেবে নিয়ে নিজের উদর স্ফীত করতে, মাযারের নামে শিরনীর মাল-সামান আত্মসাৎ করতে এতটুকু কুণ্ঠিত মনে হয় না। ওদিকে খোঁজ নিয়ে দেখুন, প্রায় প্রত্যেকটি পরিবারে ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া-ফাসাদ, আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে দলাদলি, রেষারেষি, খুন-যখম, মুসলিম দেশগুলিতেই যেন বেশী। শুধু কি তাই? লোভ-লালসা হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রী কাতরতা, মোনাফেকী, অহমিকা, কুসংস্কার ও অনুদারতা কি আজকের মুসলিম সমাজেই মাত্রারিক্ত নয়? ব্যতিক্রম অবশ্যই দু'চারজন রয়েছেন। কিন্তু বেশির ভাগের অবস্থা কমবেশী এ রকমটাই। এখানে যখন তখন যাকে তাকে কাফির ফতোয়া দেওয়ার মহড়া, মজহাবী-কোন্দল নিয়ে ধর্মের জয়ঢাক পেটানো, শির্ক-বেদাত আর ফাসেকী কাম-কাজকে ধর্মের আলখোল্লা পড়িয়ে বাজার মাত করা, ধর্মের নামে ব্যবসা ফাঁদা, ধর্মের নামে যুলুম চালানো, যালিমকে সমর্থন প্রদান, ধর্মের নামে দুঃশাসনের যাঁতাকলে মানবজীবনকে পিষ্টকরণ–কোনটা বাদ রয়েছে? তবুও আমি নিরাশ নই। আমি জানি এবং বিশ্বাস করি, এই শত কোটি মুসলমান যদি সত্যিকারের

ঈমানী 'কুয়ত' আর জোশ-জজবা নিয়ে জেগে উঠে, তাহলে এরাই আবার গোটা বিশ্বকে নাড়া দিতে পারবে।" দৈনিক ইত্তেফাক, স্থান কাল-পাত্র : ২৪শে আষাঢ়, ১৩৯২ বাংলা, (৯/৭/৮৫ইং)।

"খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইসলামের আবির্ভাবের প্রক্কালে জাহেলিয়াতের যে অন্ধকার বিরাজমান ছিল, বর্তমান যুগেও সভ্যতা ও সংস্কৃতির নামে মুসলিম-সমাজে অনুরূপ জাহেলিয়াতই প্রসার লাভ করেছে। (মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আল হেলাল চতুর্থ খন্ড, পৃ: ১০৩)

এই সকল পরিস্থিতি এবং আখেরী যামানার এরূপ অবস্থা সম্পর্কে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী লক্ষণীয়। হাদীসের গ্রন্থাবলীতে বলা হয়েছে: "মানুষের ওপর এমন সময় আসবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলো অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলো বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হবে, কিন্তু হেদায়াত শূন্য থাকবে। তাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম জীব হবে। তাদের মধ্য হতে নিদর্শন ফিতনা হবে এবং তাদের মধ্যে ফিরে যাবে।" (বায়হাকী ও মিশকাত)। এই ধরণের অন্যান্য হাদীসের অনেকগুলো উদ্ধৃতি পূর্বে উল্লেখ করেছি।

(ঘ) আশার আলো :

বর্তমানের ভয়াবহ বিশ্ব-পরিস্থিতি হতে মানবজাতির উদ্ধারের জন্য প্রতিশ্রুত ব্যবস্থা আছে কি-না, সেটাও একবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। তাই এই লেখার মাধ্যমে ঐশী-প্রতিশ্রুত পথের খোঁজ করে সেই পথের কার্যকারিতাকে পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিশ্বের সচেতন বিবেকের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন :

"ইসলাম ব্যাতিরেকে সকল ধর্ম লুপ্ত হবে এবং সকল অস্ত্র ভেঙ্গে যাবে, পরন্তু ইসলামের ঐশী অস্ত্র, যা না ভাঙ্গবে, না ভোতা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহা অন্ধকারের সকল শক্তিকে (দাজ্জালিয়াত) ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। সেই সময় সন্নিকট, যখন খাঁটি- তওহীদ, যা ধর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ মাক্কাবাসীগণও তাদের অন্তরে অনুভব করবে, চড়াচড়ে ছড়িয়ে পড়বে। সেদিন কোন ঝুটা প্রায়শ্চিত্ত অথবা মিথ্যা উপাস্য থাকবে না। ঐশী হস্তের একটি আঘাত অধর্মের সকল কুচক্র (দাজ্জালিয়াত)-কে ধ্বংস করবে। কিন্তু তরবারি বা বন্দুকের সাহায্যে নহে, পরন্তু কতকগুলি আত্মাকে ঐশী জ্যোতির দ্বারা আলোকিত করে এবং কিতাবগুলি হৃদয়কে ঐশী দীপ্তিতে অনুপ্রানিত করবে। কেবল সেই সময়ই বুঝবে, যা আমি বলছি"।

"মিথ্যাবাদী কি কখনও সফলকাম হতে পারে? নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা সীমালঙ্ঘনকারী মিথ্যাবাদীকে কখনও সফলতার পথ দেখান না' (সূরা মু'মেন : ২০২) মিথ্যাবাদীর ধ্বংস ও নিপাতের জন্য তার মিথ্যাই যথেষ্ট। যে কার্য খোদা তাআলার জালাল ও প্রতাপ এবং তাঁর রসূল করীম (সা.) এর বরকত ও কল্যাণরাজি প্রকাশ ও প্রমাণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে এবং যে বৃক্ষ স্বয়ং খোদা তাআলার হস্তে রোপিত হয়, তার হেফাযত স্বয়ং ফিরিশ্‌তাগণ করেন। এমন কে আছে, যে উহাকে বিনষ্ট করতে পারে? স্মরণ রাখিও, যদিও আমার কায়েমকৃত সেলসেলা নিছক দোকানদারী হয়, তাহলে উহার নাম নিশানা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

কিন্তু যদি ইহা খোদা তাআলার পক্ষ হতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, এবং নিশ্চয় ইহা তারই পক্ষ হতে কায়েমকৃত, তাহলে যদি সমগ্র জগতব্যাপী ইহার বিরুদ্ধাচরণ করে তথাপি ইহা বর্দ্ধিত হবে, প্রসার লাভ করবে এবং ফিরিশ্‌তাগণ ইহার হেফাযত করবেন। একজন ব্যক্তিও যদি আমার সাথে না থাকে এবং কেউ যদি আমাকে সাহায্য না করে, তথাপি আমি দৃঢ় প্রত্যয় রাখি যে, এই সেলসেলা সাফল্যমন্ডিত হবে। বিরোধিতার আমি কোনই পরোয়া করি না। আমি ইহাকেও আমার উন্নতির জন্য অপরিহার্য বলে মনে করি। এমন কখনও হয় নাই যে, খোদা তাআলা কোন মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট এবং খলীফা জগতে এসেছেন, অথচ মানুষ তাকে নীরবে গ্রহণ করেছে" (আল হাকাম, ১৭ জুলাই, ১৯০৫, মলফুযাত, ৭ম খন্ড, পৃ: ১৪৮)।

"আমি সত্য সত্যিই বলছি যে, এই সেলসেলা খোদা তাআলার পক্ষ হতে কায়েম করা হয়েছে। যদি ইহা মানবীয়- কৌশল ও পরিকল্পনার প্রতিফল হতো, তাহলে মানবীয় কলা-কৌশল ও প্রচেষ্টা এবং মানবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এ পর্যন্ত ইহাকে নিশ্চিহ্ন করে দিত। যাবতীয় মানবীয় প্ররোচনার মোকাবেলায় ইহার বর্দ্ধিত হওয়া এবং ক্রমাগত ইহার উন্নতি লাভ করাই খোদা তাআলার পক্ষ হতে ইহা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। সুতরাং তোমরা নিজেদের একীন ও বিশ্বাসের শক্তি যত বৃদ্ধি করবে, ততই তোমাদের হৃদয় উজ্জ্বল ও উজ্জীবিত হবে। কুরআন শরীফ অধ্যয়ন কর এবং খোদা তাআলা সম্পর্কে কখনও নিরাশ হবে না। মু'মেন কখনও খোদা তাআলা হতে নিরাশ হয় না। তাঁর সম্পর্কে নিরাশ হওয়া অবিশ্বাসীদের কাজ আমাদের খোদা তাআলা 'আলা কুল্লে শাইয়িন কাদীর'–'সর্বশক্তিমান খোদা।'

(আল্-হাকাম ২৪ জুন, ১৯০২ মলফুযাত, ৩য় খন্ড, পৃ:)

"আমি জানি, খোদা তাআলা আমার সংঙ্গে আছেন। যদি আমি পিষ্ট হয়ে যাই এবং পদদলিত হয়ে যাই এবং এক অণুর চেয়েও ক্ষুদ্রতর হয়ে যাই এবং চতুর্দিক হতে দুঃখ বেদনা এবং অভিশাপ পতিত হয়, তবুও আমি জয়ী হবো। যিনি আমার সাথে আছেন, তিনি ব্যতীত আমাকে আর কেউ জানে না। আমি আদৌ বিনষ্ট হবো না। শত্রুর সকল প্রচেষ্টা নিরর্থক এবং বিরুদ্ধবাদীদের সকল অভিসন্ধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে।

আমাদের পূর্বে কি কোন সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে, যে আমি ধ্বংস হবো? কোন সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা কি কখনও অপমানের সাথে বিনাশ করেছেন যে, আমাকেও তিনি বিনাশ করবেন? নিশ্চয় স্মরণ রাখিও এবং কান পাতিয়া শ্রবণ কর যে, আমার আত্মা বিনাশ হবার নয় এবং আমার প্রকৃতিতে আমার অকৃতকার্যতার বীজ নেই।"

(আয়নায়ে কামালতে ইসলাম পুস্তক)

(ঙ) ধর্মীয় স্বাধীনতা ইসলামের মূল শিক্ষা:

আহ্‌মদীরা মুসলমান। আহমদীয়া জামাতের নেতা ঘোষণা করেছেন: " পরিত্রানের ঘরে দাখিল হওয়ার দরজা হচ্ছে পবিত্র কালেমা- ***"লা ইলাহা ইল্লালাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।" (হুজ্জাতুল ইসলাম পুস্তক)*** । তাদের বিশ্বাস, মহানবী (সা.) খাতামান নবীয়ীন এবং শরীয়তধারী আখেরী নবী এবং পবিত্র কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ শরীয়ত। হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেনঃ "আকেলকো দ্বীন পর হাকেম না বানাও হারগিজ। ইয়ে তো আনধী হ্যায়, গর নৈয়ারে ইলহাম সাথ না হো।" অর্থঃ-"জড়-জ্ঞানকে কখনও ধর্মের উপর বিচারক রূপে খাড়া করিও না। কারণ ইহা স্বয়ং অন্ধ, যদি না ইহার সঙ্গে

আল্লাহতা'লার বানীর নূর সংযুক্ত হয়।"

আলোচ্য বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে সর্বপ্রথমে পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনার বিষয়টি পূণরায় উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং তা হলো আল্লাহ্‌তালার সেই ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি), যা আল্লাহ্‌তালা সূরা নূরের আয়াতে ইস্তেখলাফ অর্থাৎ খেলাফত প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত আয়াতে ঘোষনা করেছেন। সেই সঙ্গে সূরা জুমুআ : ৪, সূরা নিসা : ৭০, সূরা সেজদা : ৬, সূরা সাফ : ১০, আয়াত সমূহের বরাত দ্রষ্টব্য। এই সকল বরাতের প্রেক্ষিতে আহমদীরা বিশ্বাস করে যে, প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ(আঃ) এসেছেন এবং বর্তমানে তাঁর খেলাফতের যুগ চলছে।

বর্তমানে আহমদীয়া জামাতের ইমাম মাহদী ও জামাতের খেলাফত ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানদের কোন খলীফা নাই।

দ্বিতীয়তঃ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) বলেছেন যে, আখেরী যুগে 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত' অর্থাৎ তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর খলিফাগনের মাধ্যমে ইসলামের প্রচার-জনিত বিশ্ব-বিজয় হবে এবং মুসলমানদের অভ্যন্তরীন বিভেদ-বিশৃংখলার অবসান হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী সত্যিকার বিজয় এবং বিশ্ব-মুসলিম ঐক্য এবং ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বর্তমানে এক বিশাল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে আহমদীয়া জামাতের খলীফার নেতৃত্বের মাধ্যমে। ঐশী-অনুমোদিত বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব দানকারী কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের এই মূহুর্তে কোন অস্তিত্ব কোথাও আছে কি-না তা ভেবে দেখতে উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

তৃতীয়তঃ হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ বলেছেনঃ "যেহেতু কোন মানুষকে চিরস্থায়ী জীবন দেওয়া হয় নাই, সেইজন্য খোদাতালা ইচ্ছা করেছেন যে, নবীগনের সত্তাকে, যা পৃথিবীর সকল সত্তা আপেক্ষা অধিকতর মর্যাদাশীল এবং সর্বোত্তম , তা কেয়ামত পর্যন্ত সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং এই উদ্দেশ্যে খেলাফতের ব্যবস্থা করেছেন"। (আল-অসিয়ত)।

তিনি আরো বলেছেনঃ "সুতরাং হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ! তোমরা ভেবে দেখ, ইহাই কি সেই সময় নহে যখন ইসলামের জন্য আসমানী সাহায্যের আবশ্যকতা অনূভুত হচ্ছে?" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলামঃ ২৫১পৃঃ) তিনি আরও বলেছেন :

"ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা না কেসি আওর কা ওয়াক্ত, ম্যায় না আতা তু কোই আওরহি আয়া হোতা"।

অর্থঃ সময় তো ছিল মসীহার সময়, অন্য আর কারো সময় নয়। যদি আমি না আসতাম, তাহলে কেউ না কেউ আসতোই।

(ক) হযরত মাওলানা নূর উদ্দীন খলীফাতুল মসীহ আউয়াল (রা.) বলেছেনঃ

"জামাত-বদ্ধ হয়ে থাকা বড়ই প্রয়োজন। এমনকি অনেকে একত্রিত না হলে আল্লাহর ফযলকে লাভ করা সম্ভব না। অত্রএব, এটা খুবই নিশ্চিত, জামাতের মধ্যে (পরস্পরের মধ্যে) একতা, ঐক্য, এক কেন্দ্রের সাথে পূর্ণমাত্রায় সংশ্লিষ্ট হওয়া এবং দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নির্ভর করে খলীফার প্রতি আনুগত্যের উপর"। (আল ফযল;রাবওয়াহ; ৪সেপ্টম্বর, ১৯৩৭ইং)

(খ) হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা:) বলেছেনঃ

"আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর খলীফা। অতএব আমি আফগানিস্তানের মানুষদের জন্য খলীফা, আরব, ইরান, চীন, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, সুমাত্রা, জাভা, এমনকি ইংল্যান্ডের অর্থাৎ সারা দুনিয়ার মানুষের খলীফা। পৃথিবীর কোন দেশ নেই, যার ওপর আমার ধর্মীয়-আধিপত্য নেই। সকলের জন্য একই নির্দেশ এই যে, আমার হাতে বয়াত করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ:) এর জামাতে প্রবেশ কর"। (আল ফযল, ১লা নভেম্বর ১৯৩৪ইং)

"হে বন্ধুগণ! আমার আখেরী নসীহত এই যে, সমস্ত কল্যাণ ও বরকত খিলাফতে নিহিত রয়েছে। নবুওত একটি বীজ বপন করে, যাহার পর খিলাফত উহার 'তাসির' ও প্রভাবকে দুনিয়ার ছড়াইয়া দেয়। তোমরা খিলাফতে-হাক্কাকে মজবুতীর 'সহিত ধরো এবং উহার আশীস ও বরকতের দ্বারা জগতকে উপকৃত কর, যাহাতে খোদাতালা তোমাদের উপর করুণা ও রহমত বর্ষণ করেন এবং তোমাদিগকে এই জাহানেও উন্নত করেন এবং সেই জাহানেও সম্মানিত করেন।"(আল-ফযল ২০শে মে ১৯৫৯ইং)

(গ) হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস(রহ.) বলেছেনঃ

"হে আমার প্রিয় ভ্রাতাগণ! আল্লাহ্‌র নৈকট্যের যে সকল মোকাম ও মর্যাদা তোমরা হাসিল করিয়াছ, যদি সেইগুলোকে কায়েম রাখিতে এবং রূহানীয়াতে সদা উন্নতি লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে যুগের খলীফার আঁচলকে ধরো এবং যদি উহা ছুটিয়া যায়, তাহা হইলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)- এর আঁচল ছুটিয়া যাইবে।" (আল ফজল, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ ইং)

(ঘ) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহেঃ) বলেছেনঃ

"খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পৃথিবীতে তৌহীদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আল্লাহ্‌তালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, খেলাফত এবং এর সুফল লাভের জন্য এর প্রতিষ্ঠা অটল ও নিশ্চিত। আহমদীয়া জামাতের মাঝে খেলাফত চির-সবুজ ও চির-প্রবহমান সুগন্ধ ছাড়ানোর মত জিনিস। এটি এমন গাছ, যার শিকড় অত্যন্ত দৃঢ়। কোন ঝড়-বৃষ্টি একে উপড়ে ফেলতে পারবে না। এটি এমন গাছ, যার ওপর সব সময় বসন্ত কাল বিরাজ করে। কখনই পাতা ঝরে পড়ে না। সব সময় টাটকা ফল পাওয়া যায়"। (আল ফযল ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১ইং)

"সমগ্র মুসলিম-বিশ্ব সম্মিলিতভাবে শক্তি ও বল প্রয়োগ করে (যদি পারে) খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে দেখাতে পারে। তারা তা পারবে না। কারণ, খেলাফতের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র ইচ্ছার সাথে সম্পৃক্ত। আল্লাহ্‌তালা খলীফা হিসাবে এমন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেন, যাকে তিনি তাক্‌ওয়াশীল মনে করেন"। (জুমআর খুতবা, ২ এপ্রিল ১৯৯৩ইং)

(ঙ) হযরত মির্যা মাসরুর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেছেনঃ

"স্মরণ রাখবে যে, খোদা সদা প্রতিজ্ঞা পালনকারী। তিনি আজও হযরত মাহদী (আ.)- এর প্রিয় জামাতের উপর হাত রেখে আছেন। তিনি আমাদেরকে কখনও পরিত্যাগ করবেন না। তিনি যে ওয়াদা তাঁর সাথে করেছিলেন, তা পূরণ করে চলেছেন, যেমন পূর্ববর্তী খেলাফতের যুগেও করেছিলেন। তিনি আজও তাঁর প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি যা তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-এর সাথে করেছিলেন, সেই রহমত ও ফযল নাযেল করেছেন, যেমন পূর্বে করেছিলেন। ইনশাআল্লাহ্‌ ভবিষ্যতেও এমন করে যাবেন। ***কেবল প্রয়োজন এই যে, কেউ যেন আল্লাহ্‌তা'লার নির্দেশাবলী অমান্য করে হোঁচট না খেয়ে বসে এবং***

নিজের পরকাল নষ্ট না করে।" (আল-ফযল, ৪জুন ২০০৪ইং)

হযরত খলীফাতুল মসীহ খামেস (আইঃ) বর্তমান যুগের জটিল সমস্যাবলীর সমাধানের লক্ষ্যে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যুদ্ধপ্রতিহত করার পথ ও পন্থা সম্বলিত একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছেন (২৭ জুন ২০১২ইং) যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্যাপিটল হিল'-এ আয়োজিত বিশেষ সভায়। উল্লেখ্য যে, উক্ত ভাষণ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে।

ভাষণটির একাংশে তিনি বলেছেনঃ

"আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত সম্পূর্ণভাবে একটি ধর্মীয়-সংগঠন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হলো,যে মসীহ্ এবং সংস্কারকের এ যুগে আবির্ভাবের ও বিশ্বকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত করার কথা ছিল, তিনি সত্যিই এসে গেছেন। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা কাদিয়ান নিবাসী হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ(আ.)-ই হলেন সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও সংস্কারক। আর এ কারণে আমরা তাঁকে গ্রহণ করেছি। আমরা তাঁর শিক্ষার আলোকে পবিত্র কুরআনের অনুশাসন মেনে চলি, আর ইসলামের সেই প্রকৃত ও খাঁটি শিক্ষার প্রচার করি যার, ভিত্তি হলো পবিত্র কুরআন। তাই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ন্যায়ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপন প্রসঙ্গে আমি যা বলবো, তা হবে কুরআনের শিক্ষার আলোকে।"

উক্ত ভাষণের মাধ্যমে বিশ্ব-সমস্যাবলীর, বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধের সমস্যাবলী প্রতিহত করার জন্য পবিত্র কুরআনের আলোকে অত্যন্ত কার্যকর পথ ও পন্থার যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে-***বিশেষ করে সুরা হুযুরাতের আলোকে তা আজকে গ্রহণ এবং কার্যকর করলে আগামীকাল থেকে বিশ্ব-শান্তি নিশ্চিত-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।***

আল্লাহতালার অপার অনুগ্রহে ইসলামী শিক্ষার আলোকে আজ বিশ্বব্যাপী মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে একতা ও সম্প্রীতি পূন:প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা ধর্মীয়-নেতৃত্ব দানকারী খলিফার পরিচালনাধীনে সাড়া দেওয়ার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি। সেই সাথে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিশ্ব-শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপত্র-দানকারী এবং সতর্ককারীর ভূমিকা পালন করে চলেছেন। যুগ খলীফা-র এই বিষয়ের প্রতিও বিশ্বের সুধী-সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

ইমাম মাহদী হওয়ার দাবীকারকের মাধ্যমে প্রকাশিত ঐশী-সাহায্য-পুষ্ট হাজার হাজার নিদর্শন সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। 'সূর্যই সূর্যের অস্তিত্বের প্রমাণে'র ন্যায় তাঁর দাবী সমূহ প্রকাশ্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং সু-প্রমানীত। কারো সন্দেহ থাকলে বিকল্প দাবীকারকের নাম বলেন না কেন? অথবা কেউ এখনও ঐরূপ দাবী করার সৎসাহস দেখান না কেন? জ্বালাও-পোড়াও-নীতি কি ইসলাম সমর্থিত? পবিত্র কুরআনের আলোকে যুক্তির মাধ্যমে এবং প্রচারের মাধ্যমে আহমদীরা বর্তমানে ২০২টি দেশে খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে শান্তিপূর্ণ পন্থায় এক বিশাল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মুসলমানদের অন্য একজন আধ্যাত্মিক নেতা 'খলিফা' হওয়ার দাবী (এটাই ঐশী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রথম ও প্রধান শর্ত) করত: সারা পৃথিবীতে মুসলমানদেরকে ধর্মীয় ব্যাপারে এক প্লাটফর্মে এক মন্ডলী-ভুক্ত করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন না কেন? ইংরেজীতে বলে "Example is better than precept" অর্থাৎ "উপদেশ বানীর চাইতে দৃষ্টান্ত প্রদান করাই উত্তম পদ্ধতি।" সত্য-সন্ধানীদের জন্য প্রকৃত পথ ও পন্থা হলো ঐশী-প্রেম। যেভাবে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ:) লিখেছেনঃ "কেয়া জিন্দেগী কা জাওক আগার উওহ নেহী মেলা, লানাৎ হ্যায় অ্যায়সে জিনেপে গার উছছে হ্যায় জুদা।"(দুররে সমীন) অর্থ ঃ" সেই জীবনের স্বাদ (সার্থকতা) কি, যদি সেই ব্যক্তি খোদার দেখা না পায়। এই রকম জীবনের উপর অভিশাপ বর্ষিত হোক, যদি সেই জীবন স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন হয়।" ***ইসলাম জিন্দাবাদ। খাতামান্নাবীঈন মোহাম্মদ (সা.) জিন্দাবাদ। খেলাফত জিন্দাবাদ।***

পরিশেষে হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.)- এর কণ্ঠে মিলিয়ে আমাদের উদাত্ত আহবান হলো:

"হার তরফ আওয়াজ দেনা হ্যায় হামারা কাম আজ, যিসকী ফিতরাত নেক হ্যায় ওয়ো আয়েগা আনজামকার।"

"চতুর্দিকে আহবান জানানো আমাদের দায়িত্ব। যার স্বভাব নেক, সে-ই পরিশেষে আমাদের ডাকে সাড়া দিবে।"(হযরত মসীহ মাওউদ আ.)।

প্রকাশিত হয়েছে

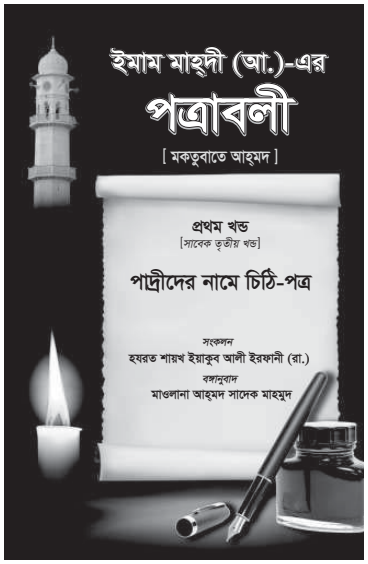

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

মাহমুদ আহমদ সুমন

(১১তম কিস্তি)

ইসলামের হেফাজতকারী স্বয়ং আল্লাহ্:

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য যেভাবে শান্তি কামনা করেছেন, তেমনি তিনি সর্বস্তরে সেই শান্তি প্রতিষ্ঠাও করেছেন। ইসলাম এমন একটি সত্য-ধর্ম, যার প্রমান দেয়ার যেমন প্রয়োজন নেই, ঠিক তেমনই বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়েও কারো কোন সন্দেহ থাকার কোন অবকাশ নেই। এই সত্য-ধর্ম এবং সত্য ও শ্রেষ্ঠ নবীর অবমাননা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। একটু ভেবে দেখুন! ধর্ম অবমাননা বা রসূল (সা.) অবমাননা করা কারো পক্ষে কী সম্ভব? যে ধর্মের হেফাজতকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা, আর যে-নবীর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ স্বয়ং আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন, সেখানে যদি কেউ অবমাননার কথা উল্লেখ করেন, তাহলে তার চেয়ে হতভাগা আর কে হতে পারে? বাংলায় প্রচলিত একটি প্রবাদ আছে, আর তা হলো, 'চাঁদে থুথু দিলে সে থুথু নিজের মুখেই পড়ে'। তাই যদি হয়, তবে সবচেয়ে সম্মানিত রসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) বা পবিত্র ইসলামের বিরুদ্ধে আজে বাজে কথা বললে এতে ইসলামের কী ক্ষতি হতে পারে? আমাদের ধর্ম কি এতই ঠুনকো যে, মানুষের মুখের কথায় তা নষ্ট হয়ে যাবে? যে ধর্ম শত-সহস্র বাধা-বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে ১৪'শ বছর পার করে টিকে গেছে, সেটি সামান্য দু'একজন হতভাগা মানুষের কথায় ধ্বংস হয়ে যায় কীভাবে?

মহানবী (সা.)-কে প্রথমে মক্কায় এবং পরবর্তীতে মদীনায় কতই না কটু-কথা, কত অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তার ইতিহাস সবার জানা রয়েছে। এ কারণে তিনি (সা.) কি কাউকে শাস্তি দিয়েছেন? কক্ষনো না। আমরা কি কখনও ভেবে দেখেছি, ধর্ম-জগতে সবচেয়ে বড় অপরাধ হচ্ছে শিরক বা খোদার সাথে কাউকে সমকক্ষ হিসেবে দাঁড় করানোর বিষয়টি। কিন্তু এ সত্ত্বেও শিরকের কারণে কোন জাগতিক-শাস্তি প্রদানের বিধান নেই। কেন? কারণ হলো, আল্লাহ্ স্বয়ং এর বিচার করবেন, বান্দা করবে না। বরং মুশরিকরা যেসব জিনিষ বা মানুষকে আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে দাড় করায়, তাদেরকেও মন্দ নামে ডাকতে খোদা তাআলা নিষেধ করেছেন (সূরা আনআম ঃ ১০৯)। যদি সবচেয়ে বড় গর্হিত ধর্মীয়-অপরাধ শির্কের কোন জাগতিক-শাস্তি না থাকে, তাহলে অন্যান্য অপকর্মের ক্ষেত্রে আমাদের এত বাড়াবাড়ি কেন? আমরা কি তবে নৈরাজ্য সৃষ্টির কাজে লিপ্ত হচ্ছি! অথচ আল্লাহ তাআলা বলেছেন, নৈরাজ্য সৃষ্টি হত্যার চেয়েও বড় অপরাধ! আল ফিতনাতু আশাদ্দু মিনাল কাত্‌লি (সূরা বাকারা ঃ ১৯২)। অ-ইসলামী বা ইসলাম বিরোধী পন্থায় আর যাই হোক, ইসলাম যেমন প্রতিষ্ঠা করা যায় না, তেমনি শান্তিও প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর জ্বালাও পোড়াও এর মাধ্যমে সমাজে কেবল বিশৃঙ্খলাই সৃষ্টি হতে পারে, শান্তি নয়।

ধর্মের নামে সন্ত্রাসী-কার্যকলাপ ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। আজ যারা বিভিন্ন ইসলামিক-সংগঠনের নামে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছে, পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মত অত্যন্ত জঘন্য কাজটি করেছে, তাদের বলতে চাই, ইসলামের হেফাজত করা কার দায়ীত্ব? যিনি ইসলামকে এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে মনোনিত করেছেন তাঁর, না-কি তথাকথিত ইসলামি সংগঠনগুলোর? ইসলাম রক্ষার কথা বলে সহজ সরল ধর্ম প্রাণ মানুষদের করা হচ্ছে আজ বিভ্রান্ত। এর দায়ভার কি এদের নিতে হবে না? ইসলামকে কিভাবে রক্ষা করতে হবে, এর সম্পূর্ণ দায়দায়ীত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের হাতে। যে কাজ আল্লাহর নিজের, সেই কাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে কি শিরকের দায়ে পড়তে হবে না? পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'তিনিই তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যেন তিনি সব ধর্মের ওপর একে বিজয়ী করে দেন, মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক' (সূরা তাওবা: ৩৩)। কে ইসলাম ধর্মকে পছন্দ করলো বা অপছন্দ করলো তা দেখার জন্য আল্লাহ কাউকে মনোনিত করেননি। ইসলাম সত্য-ধর্ম আর এই ধর্মকে সব ধর্মের ওপর বিজয়ী করার ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলারই। এটা স্পষ্ট যে, ইসলাম ধর্মের আদেশ এবং নীতির মহত্ব বা পরমোৎকর্ষ ইতোমধ্যেই ক্রমশ স্বীকৃতি লাভ করে চলছে এবং সেদিন বেশি দূরে নয়, যখন ইসলাম অন্যান্য সকল ধর্মবিশ্বাসের উপর বিজয় লাভ করবে। এবং সেইসব ধর্মের অনুসারীরা দলে দলে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে সমবেত হবে। অবশ্য সবাই এই শান্তির ধর্মে আশ্রয় নিবে, তবে তা তথাকথিত ইসলামী সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে নয়, তা হবে কুরআনের উন্নত-শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে।

ইসলাম পরিপূর্ণ একটি ধর্ম। এই ধর্মের কোন ক্ষতি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার

নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে আমি তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম' (সূরা মায়েদা: ৪)। পবিত্র কুরআনের ব্যাপারেও আল্লাহ্ তাআলার ঘোষণা হল 'নিশ্চয় আমরাই এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমরাই এর সুরক্ষাকারী' (সূরা হিজর: ১০)। এই আয়াতে কুরআন করীমকে অবিকলরূপে সংরক্ষণ করার যে প্রতিশ্রুতি আছে, তা এমন সুস্পষ্টরূপে পূর্ণতা লাভ করেছে যে, অন্য কোন প্রমাণ যদি না-ও থাকতো, তবু এই সত্যই কুরআনের এলাহী উৎস প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতো।

এমন এক সময়ে এই সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণের (রা.) জীবন চরম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ছিল এবং শত্রুপক্ষ নতুন ধর্মমতকে সহজেই নিষ্পেষণ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারত। এরূপ এক অবস্থার মধ্যে কাফেরদেরকে তাদের চরম অপচেষ্টা দ্বারা একে ধ্বংস করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান জানানো হয়েছিল এবং একই সাথে তাদেরকে সাবধানও করে দেয়া হয়েছিল যে তাদের সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহ্ তাআলা ব্যর্থ করে দিবেন। কারণ তিনি (আল্লাহ্) স্বয়ং এর হেফাজতকারী।

এই দাবী ছিল দ্ব্যর্থহীন ও খোলাখুলি এবং শত্রুপক্ষ ছিল শক্তিশালি ও নির্মম। তথাপি কুরআন যাবতীয় বিকৃতি, প্রক্ষেপ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিরাপদ থেকে অব্যাহতভাবে স্বীয় নিরাপত্তার বিজয় ঘোষণা করে চলেছে। আল্লাহ্ তাআলা মহানবী (সা.)-কে কুরআন শরীফের সুরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা এক স্থায়ী-প্রতিশ্রুতি। পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে, ইসলাম ও কুরআনের হেফাজতের দায়ীত্ব স্বয়ং আল্লাহ্ নিয়েছেন, আর এর হেফাজতও তিনি সঠিকভাবেই করছেন। নতুন করে কেউ যদি বলে যে, আমরা এর হেফাজতের দায়িত্ব নিচ্ছি, এর মানে হচ্ছে নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ্ দায়ীত্ব পালন করতে পারছেন না।

ইসলাম সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে সে-ও তো চাইবে না, যে কাজ আল্লাহর জন্য নির্দ্ধারিত সেই কাজে হাত দেয়া। তাহলে বর্তমানে ইসলাম রক্ষার নামে তথাকথিত একটি ইসলামী সংগঠন কিভাবে দাবী করছেন যে তারা ইসলামের হেফাজত করবে? এই ধরনের দাবী করে এরা কি ইসলাম ও রসূলের অবমাননা করছেন না?

আমরা জানি, বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে কাফেররা কতই না অত্যাচার করেছে, কতই না গালিগালাজ করেছে। এর উত্তরে কি তিনি (সা.) কখনো রাগান্বিত হয়ে কিছু করেছেন? বর্তমান সময়ে যদি কোন হতভাগা ইসলামের অবমাননা করে থাকে, তবে তাকে সুন্দর ভাবে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে বুঝানো উচিৎ। তাকে না বুঝিয়ে, তার মাথায় আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলার নামতো ইসলাম নয়। কেই যদি ইসলামের বদনাম করে, তাহলে ইসলামের শিক্ষা হল ধৈর্য ধারণ করা এবং উত্তমভাবে এসব কথাকে পরিহার করে চলা।

পবিত্র কুরআনে মাহন আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন' (সূরা মুজাম্মেল: ১১)। এখানে আল্লাহ্ কি এটা বলতে পারতেন না যে, যারা আপনাকে অপমান করে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। কিন্তু কী বলা হয়েছে? বলা হয়েছে, সবর করুন আর সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করুন। কাফেররা সব সময়ই হযরত রসূল করীম (সা.)-কে কষ্ট দিতো এবং অবমাননাকর কথা বার্তা বলতো। কিন্তু কখনই তিনি এসবকে পাত্তা দিতেন না। তিনি জানতেন, এসব কথাবার্তায় মন খারাপ করে কোন লাভ নেই। কারণ, আল্লাহ এই ধর্ম এবং এই রসূলকে পাঠিয়েছেন। তিনিই এর হেফাজত করবেন এবং সম্মান অক্ষুন্ন রাখবেন, কাফেররা যা-ই করুক না কেন। যেভাবে পবিত্র কুরআনের অন্যত্রে বলা হয়েছে, 'আমি জানি যে, আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন'। অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্মরণ করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান। এবং পালন কর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে (সূরা হিজর: ৯৮-১০০)।

হযরত রসূল পাক (সা.) অবিশ্বাসীদের বিদ্রুপের কারণে কখনই ব্যথিত ছিলেন না, বরং তিনি ব্যথিত থাকতেন একটি কারণে, আর তা ছিল আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীর শরীক করার কারণে। তার দুঃখের কারণ ছিল- এক দিকে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অকৃত্রিম ও গভীর ভালবাসা, অন্যদিকে তার জাতির জন্য উৎকণ্ঠা ও চিন্তা। তিনি তার জাতির সংশোধনের জন্য সর্বদা খোদা তাআলার কাছে দোয়া করতেন। তাদের সংশোধনের জন্য তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র দরবারে কেঁদে কেঁদে এই প্রার্থনাই করতেন, 'হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে ক্ষমা কর, কারণ এরা বুঝে না'। আজকে যারা ইসলামের হেফাজতের নামে বা অন্যান্য নামে 'ইসলাম রক্ষার' কাজে রত, তারা কি বুকে হাত দিয়ে এই কথা বলতে পারবেন যে, যারা ইসলামের অবমাননা করছে বলে আপনারা ধারনা করেন, তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আপনারা দোয়া করেছেন? হাদীসে পাওয়া যায়, কারো দোষ দেখলে তার সংশোধনের জন্য কম পক্ষে চল্লিশ দিন যেন আমরা দোয়া করি, এটা কি আপনারা কেউ করেছেন? আপনারা যদি ইসলামের প্রকৃত অনুসারীই হয়ে থাকেন, তাহলে ইসলামী-পন্থায় আপনাদের আন্দোলন হওয়ার কথা ছিল। আর সেই আন্দোলন মিছিল-মিটিং, ভাঙ্গচুর আর জ্বালাও পোড়াও করে নয়, দোয়ার মাধ্যমে।

ধর্মের নামে সন্ত্রাসী-কার্যকলাপ ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। আজ যারা বিভিন্ন ইসলামিক-সংগঠনের নামে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করছে, পবিত্র কুরআন পোড়ানোর মত অত্যন্ত জঘন্য কাজটি করেছে, তাদের বলতে চাই, ইসলামের হেফাজত করা কার দায়ীত্ব? যিনি ইসলামকে এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে মনোনিত করেছেন তাঁর, না-কি তথাকথিত ইসলামি সংগঠনগুলোর?

আরেকটি বিষয় নিয়ে কিছু আলোচনা করতে চাই। বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে প্রায় একটি দাবী উত্থাপন করা হয়, আর তাহলো 'আল্লাহ্, রাসুল (সা.) ও ইসলাম ধর্মের অবমাননা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রোধে সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ডের বিধান রেখে জাতীয় সংসদে আইন পাস।' অর্থাৎ 'ব্লাসফেমি আইন' পাশ করা।

আমরা জানি, বাংলাদেশের ধর্মব্যবসায়ীরা হলো সবচেয়ে মতলববাজ গোষ্ঠী। এরা যখনই কোন বিষয়ে দাবি উত্থাপন করে, তখন তার পেছনে একটা অসৎ উদ্দেশ্য থাকে। জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে 'ব্লাসফেমি আইন' পাশ করার অঙ্গিকারও ছিল। এর আগেও এরা ১৯৯৩ সনে একবার ও পরবর্তীকালে আরেকবার এই কুখ্যাত বিলটি পাশ করার অপচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

'ব্লাসফেমি আইন'টি গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও ইসলামের পরিপন্থি। 'ব্লাসফেমি আইন' প্রবর্তনের মাধ্যমে জামায়াত যেভাবে চেয়েছিল এদেশের মানুষকে আবার মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিতে, তেমনি তাদেরই ছত্রছায়ায় আবারও তথাকথিত একটি ইসলামী সংগঠন চাচ্ছে এদেশকে তালেবানি রাষ্ট্রে পরিণত করতে। আসলে, যাদের ধর্ম মানবাধিকার ও প্রকৃত-ইসলাম সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, তারাই ব্লাসফেমি আইন প্রবর্তন করতে চায়। 'ব্লাসফেমি আইন' একটি মধ্যযুগীয় ব্যবস্থা। এই সব মৌলবাদীরা যদি এ আইন বাস্তবায়ন করতে পারত, তা হলে আমাদেরকে মধ্যযুগে ফিরে যেতে হতো।

আমাদের দেশের মৌলবাদীরা এই আইন পাশ করে আমাদেরকে মধ্যযুগে নিয়ে যওয়ার অনেক চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়ে তাদেরই দলের লোকদেরকে ভিন্ন নামে মাঠে নামিয়ে তাদের দাবিগুলোকেই গ্রহণ করার জন্য উত্থাপন করাচ্ছে। মুক্ত-চিন্তা, বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মীয়-স্বাধীনতা, সবকিছুকে পদদলিত করে এই আইন সমাজে দ্বন্দ্ব-সংঘাত উস্কে দেয়া ছাড়া কিছুই করবে না। প্রশ্ন হলো,'ব্লাসফেমি ল' বানানোর জন্য মৌলবাদীরা এত উদগ্রীব কেন? পবিত্র কুরআনে ব্লাসফেমি শব্দটিই নেই, হাদীস শরীফেও নেই। ইসলামী সংগঠনগুলো ব্লাসফেমি আইনের যৌক্তিকতা দেখাত ইংল্যান্ডের আইন থেকে। সেখানেও কিন্তু এই আইনটি কার্যকর নেই।

সেই ১৯৯৩ সন থেকে ব্লাসফেমি আইন করার জন্য মৌলবাদীরা যে মরিয়া হয়ে ছিলেন, আজোও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করছেন। এই আইন সম্পর্কে তাদের প্রস্তাবিত ধারা দুটি ছিল 295B এবং 295C। এই দুটি প্রস্তাবিত আইন হচ্ছে যথাক্রমে ''কুরআন অবমাননা'' ও ''রসূল অবমাননা'' আইন। প্রথমটির জন্য নিজামী ১৯৯৩ সনের বিলে প্রস্তাব করেছিলেন 'যাবজ্জীবন কারাদন্ড' ও দ্বিতীয়টি জন্য প্রস্তাব করেছিলেন 'মৃত্যুদন্ড' অথবা 'যাবজ্জীবন কারাদন্ডের সাথে জরিমানা'। মজার বিষয় হলো, প্রস্তাবিত এই আইন দুটিই হচ্ছে পাকিস্তানী দন্ড-বিধির সংশ্লিষ্ট ধারার অবিকল নকল। তাদের তথাকথিত 'ইসলামী স্বর্গরাজ্য' প্রতিষ্ঠার প্রথম ও মৌলিক ধাপ হিসেবে তারা একাজ করতে চেয়েছিলেন। একবার এই ধাপ পার করতে পারলে ধর্ম-রক্ষার জিগির তুলে তারা যাকে ইচ্ছা একেবারে পরকালে পাঠাতে সক্ষম হবে আর না হয় কমপক্ষে যাবৎজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করতে পারবে। আর এভাবেই সুচিত হবে তাদের কল্পিত ইসলামী রাষ্ট্র অর্থাৎ 'তালেবানি রাষ্ট্র' নির্মাণের অগ্রযাত্রা। সেই সময়ের প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআনের অবমাননা ও পয়গম্বর মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি কটাক্ষ বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠিকে দারুনভাবে মর্মাহত করে এবং তজ্জনিত কারণে সামাজিক শান্তি এবং আইন- শৃঙ্খলার অবনতি ঘটার সম্ভাবনা দেখা যায়। এরূপ পরিস্থিতি রোধকল্পে কুরআন অবমাননা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি কটাক্ষ করার প্রবণতাকে সুস্পষ্ট বিধান দ্বান দ্বারা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।'

ব্লাসফেমি আইনটি সোজা কথায়-ইসলাম, তার নবী ও আল্লাহর কোন বক্তব্য পর্যালোচনা করার অধিকার কবুল করতে নারাজ? হ্যাঁ, আমরা 'কটাক্ষ', 'ধর্মাবমাননা' প্রভৃতির বদলে 'পর্যালোচনা' শব্দটিই বেছে নিয়েছি। কারণ, আমরা জানি, ধর্মসংক্রান্ত, এমনকি কোন একাডেমিক আলোচনাও যদি জামায়াত ও তার সমর্থকগোষ্ঠির স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়, তাহলেই ওরা মননশীল ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মামলা ঠুকে দেবে, ব্লাসফেমি আইনের ছত্রচ্ছায়ায় সংশ্লিষ্ট মননশীল ব্যক্তিবর্গকে রাষ্ট্রের বেতনভুক জল্লাদদের দিয়ে হত্যা করিয়ে নিবে। ইসলামের ইতিহাস থেকে এটা স্পষ্ট যে, এই ধর্মটি একই সাথে যেমন মানুষকে একটি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি উপহার দিয়েছে, তেমনই একটি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থারও সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। ইসলামের নবী নিজে 'মদিনা প্রজাতন্ত্র' নামে একটি রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পত্তন ও প্রবর্তন করেছিলেন।

ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের অনুপ্রেরণার মূল উৎস ছিল পাকিস্তান। পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী ফৌজদারী দন্ডবিধির ২৯৫ ধারার পর যে দু'টি ধারা সংযুক্ত করেছে- ২৯৫ (ক) ও ২৯৫ (খ), মতিউর রহমান নিজামী সে ধারা দু'টোকেই হুবহু দাড়ি-কমা শুদ্ধ এ দেশেও পাস করার প্রস্তাব পুর্বেও করেছিল আর গত নির্বাচনের পূর্বে অঙ্গিকার করেছিলেন- ক্ষমতায় গেলে তা অবশ্যই কার্যকর করবেন। খোদ পাকিস্তানে এই রকম মানবতাবিরোধী একটি কুখ্যাত আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হলেও এরা আমাদের দেশে এই হিংস্র আইনটি পাস করার জন্য সর্বদাই মরিয়া হয়ে আছেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা লিপ্সা আর ধর্মান্ধতা মিলে মিশে মানবতাবিরোধী কি পরিমাণ উন্মত্ততার সঞ্চার করতে পারে, এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এদের মুখ নিঃসৃত ধর্ম, ধর্মের নসিহত এ কারণেই হাস্যকর। ধর্ম কাকে বলে তা-ই তারা আসলে জানে না। ধর্ম বলতে এরা কেবল রক্ত প্রবাহিত করাটাই বুঝে।

আমাদের প্রশ্ন, যে মহান নবী আর যে মহাগ্রন্থ কোনরূপ জাগতিক আইন ছাড়া ১৪০০ বছর যথাযথ মর্যাদা নিয়ে অতিক্রম করে এসেছে, শত বিপদ ও বাধা-বিপত্তি পার করে এসেছে, তাদের মর্যাদা রক্ষায় আইন পাশ করার কি কোন প্রয়োজন আছে? কুরআন এবং রসূলের মর্যাদা কি আইন পাশ করে করতে হবে? ব্লাসফেমি ল' পাশ করে পাকিস্তানের কি যাবতীয় আর্থ-সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, না সেগুলো আরও বৃদ্ধি পেয়েছে? বুদ্ধিমান তারা, যারা অন্যের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। এই ব্লাসফেমি আইন শুধুমাত্র বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই নয়, বরং মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও বিভেদ এবং সংঘর্ষের সূচনারই আহ্বান জানায়। আমরা আশা করব, সভ্যতা-বিরোধী, মানবতাবিরোধী এই ব্লাসফেমি আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টাকে সরকার কোনভাবেই সফল হতে দেবে না।

(চলবে)

masumon83@yahoo.com

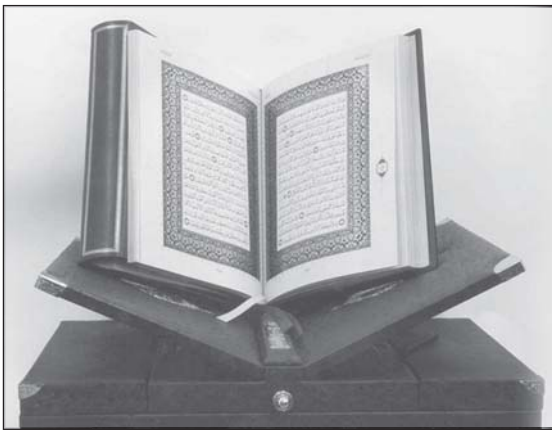

নামায সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

(৪র্থ ও শেষ কিস্তি)

নামাযের প্রতি উদাসীন এবং লোক দেখানো ব্যক্তিদের জন্য সাবধানবাণী :

পবিত্র কুরআন মজীদে অত্যান্ত সুন্দর ভাবে এর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন সূরা মাউন এর ৫ হতে ৭ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, অতএব দুর্ভোগ এমন সব নামাযীদের জন্য, "এবং যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন এবং যারা কেবল লোক দেখানো কাজ করে।

'নামায' আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতীক। কিন্তু মুনাফিকদের নামায আত্মাহীন দেহের মত। এরা আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবের প্রতি কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে না। মুনাফিক ও আচার সর্বস্ব লোকেরা আন্তরিক না হয়ে কেবল লোক দেখানোর জন্য পুণ্য ও দয়া-দাক্ষিণ্যের কাজ করে থাকে। লোক দেখানো কোন কাজই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণীয় নয়। লোক দেখানো কোন কাজে কেউ সফলতা লাভ করতে পারে না। অনেক সময় মানুষ বাহবা পাওয়ার আশায় লোক দেখানো কাজ করে থাকে। এ ধরণের কাজ অত্যন্ত ক্ষতিকর। এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লে সমাজ কলুষিত হবে।

***** প্রাত্যহিক নামাযগুলোর সময় *****

সূর্য হেলে যাওয়ার সময় থেকে রাত্রি ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত :

সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে রাতের আঁধার ছেয়ে যাওয়া পর্যন্ত তুমি নামায কায়েম কর এবং প্রভাতে কুরআন পড়াকে গুরুত্ব দাও। 'দালাকাশ্‌শাম্‌সু' (১) সূর্য পৃথিবীর মধ্যরেখা থেকে সরে গেল, মধ্যাহ্ন-সূর্য ঢলে পড়লো (২) সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করলো, (৩) সূর্য অস্ত গেল। 'গাসাকা' অর্থ রাতের অন্ধকার অথবা সূর্যাস্তের পর দিগন্তে লালিমা যখন অদৃশ্য হয়ে যায়, তখনকার অবস্থা। এই আয়াতে ইসলামের পঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময় নির্নীত হয়েছে। 'দুলুক' শব্দটি তিন প্রকার অর্থে-যোহর, আসর এবং মাগরিবের নামাযের সময় নির্দেশ করে। 'গাসাকিল্ লায়লে' বাক্যাংশটি সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামাযের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে। কিন্তু তা বিশেষভাবে রাতের নামায অর্থাৎ-এশা'র নামাযের প্রতি নির্দেশ করছে। 'কুরআনুল ফাজরে' শব্দগুলো ফজরের নামাযের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। নামাযকে বোঝা মনে করা উচিত নয়, বরং তা সাধকের জন্য সুবিধা এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের কারণ বিশেষ। এইজন্য প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানকে সময় মত নামায আদায়ের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ের ক্ষেত্রে নবী করীম (সা.) যে নীতিমালা পেশ করেছেন, তার প্রতি পাবন্দ থাকা কর্তব্য। আল্লাহ্ তাআলা সূরা হুদে ১১৫নং আয়াতে বর্ণনা করেছেন, "আর তুমি দিনের উভয়-প্রান্তে এবং দিনের কাছাকাছি রাতের বিভিন্ন অংশে নামায কায়েম কর। নিশ্চয় পুণ্য-কর্ম মন্দকে দূর করে দেয়। উপদেশদাতাদের জন্য এ এক বড় উপদেশ। এ আয়াতটিতে সারাদিনের নামাযের প্রতি মনোযগ আকর্ষণ করা হয়েছে। নামাযকে পুণ্য-কর্ম বলা হয়েছে, যা মন্দকে দূরীভূত করে বা প্রতিহত করে। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ একটি উপদেশ। যারা এ উপদেশের ওপর আমল করবে, তারাই মন্দ হতে মুক্তি লাভ করবে।

পবিত্র কুরআনের সূরা ত্বাহার ১৩১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "আর সূর্য উঠার পূর্বে এবং তা ডুবার পূর্বে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। রাতের বিভিন্ন সময়ে ও দিনের সব অংশেও (তাঁর) পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর, যাতে তুমি (তাঁর অনুগ্রহ লাভ করে) সন্তুষ্ট হতে পার। উক্ত আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা কীর্তনের সময় দ্বারা দৈনিক পাঁচবার নামাযের সময়কে বুঝায়। 'সূর্য উঠার পূর্বে' শব্দগুলো ফজরের নামাযকে বুঝায়। 'তা ডুবার পূর্বে' শব্দটি অপরাহ্নের শেষাংশ অর্থাৎ আসর নামায বুঝায়। 'রাতের বিভিন্ন সময়ে মাগরিব এবং এশার নামাযের প্রতি ইশারা এবং 'দিনের সব অংশেই পবিত্রতা ঘোষণা কর' শব্দসমূহ অপরাহ্ন অর্থাৎ দ্বিপ্রহরের পর যোহর নামাযের সময় নির্দেশ করে। সূরা আর রূম, আয়াত ১৮ তে বলা হয়েছে "অতএব তোমরা যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ কর এবং ভোরে প্রবেশ কর, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। এর পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর রাতে এবং তোমরা যখন দুপুরে প্রবেশ কর তখনো (প্রশংসা তাঁরই)'।

তারপর সূরা কাফ্-এ ৪০ নং আয়াত বলা হয়েছে "আর সূর্য উঠার পূর্বে এবং ডুবার পূর্বেও প্রশংসা সহ তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। উল্লেখিত আয়াতগুলো দ্বারা দিনে ও রাতের পাঁচ বারের নামাযের বিষয় পরিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়াও আল্লাহ্ তাআলার মহিমা ও প্রশংসা কীর্তন করার নির্দেশও রয়েছে। সুতরাং প্রতিটি মুহূর্তেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার একটি ব্যবস্থা রয়েছে, যার যখনই সময় হবে, সে নিজের মত করে আল্লাহ্‌র ইবাদত ও গুনকীর্তন করার সুযোগ পাবে। কোন অজুহাত বা আপত্তি করার ফুরসত নেই। মুসলমানদের জন্য

ইসলাম ধর্মকে কত সহজ ও সুন্দর ভাবে পালন ও মানার সুব্যবস্থা। দিনের দু'প্রান্তে এবং রাতের কিছু কিছু অংশ নামায প্রতিষ্ঠার নির্দেশ আল্লাহ্ তাআলাই দিয়েছেন।

নামাযের 'মাসায়েল' তথা নিয়মাবলী

পৃথিবীতে চলার জন্য সবকিছুতেই কোন না কোন নিয়ম-নীতি রয়েছে। সেগুলো মান্য করার মাঝে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তাই নামাযের ব্যাপারেও সেরকম কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। শুধু রুকু বা সেজদার নাম নামায নয়। পাক পবিত্রতার বিষয়ও আছে। এ সম্পর্কে নিম্নে কিছু তথ্য উল্লেখ করা হলো :

নামাযের পূর্বে ওযুর আদেশ :

কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তাআলা অযু সম্পর্কে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হলো "হে যারা ঈমান এনেছ, তোমরা যখন নামাযে দাঁড়াও বা দাঁড়াতে যাও, তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও তোমাদের হাত কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও এবং তোমরা তোমাদের মাথায় 'মাসাহ' কর ও তোমাদের পা গিরা পর্যন্ত ধুয়ে নাও। আর বীর্য-স্খলনে অপবিত্র হলে (গোসল করে) ভালভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হও' (সূরা মায়েদা : ৭)। এই আয়াতে মাথা 'মাসাহ' করার কথা বলার অব্যবহিত পরেই এসেছে পায়ের কথা। কিন্তু এর অর্থ পা দু'টিও মুছে ফেলা নয়। যেহেতু পা ধুয়া অযুর শেষ পর্যায়, তাই মাথা মুছে ফেলার পরে পায়ের কথা বলা হয়েছে। এখানে 'পা' (আরজুলা) কর্মকারকে ব্যবহৃত হয়েছে বা 'ফাগসিলু' (ধৌত কর) ক্রিয়ার কর্মকারক, অর্থাৎ পা ধুয়ে নাও। 'আরজুলাকুম' যদি 'ওয়ামসাহু' ক্রিয়ার কর্ম হতো, তাহলে 'বেরুউসিকুমের' সঙ্গে ব্যবহৃত বা অব্যয়ের কারণে তা 'আরজুলাকুম' না হয়ে 'আরজুলিকুম' হতো। ওযুর এই পর্যায়কে ফরজ বলা হয়ে থাকে। এছাড়া নবী করীম (সা.) উম্মতের কথা চিন্তা করে প্রথমে দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুয়া, এবং গড়গড়াসহ কুলি করা ও নাক সাফ করা সুন্নত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেই সাথে ওযুর প্রথমে তাসমিয়া পড়া ও শেষে ওযুর দোয়াও পড়তে হবে। পূর্ণাঙ্গীন ওযুর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে নামাযে দাঁড়ালে মনে আনন্দ ও তৃপ্তির সাথে আল্লাহ্ তাআলার হাম্‌দ বা প্রশংসা করলে নামাযে প্রকৃত স্বাদ অনুভূত হবে।

নামাযের 'আরকান' কিয়াম, রুকু, সিজদা ঃ

সূরা আল হাজ্জ, আয়াত নং ২৭-এ বলা হয়েছে যে, "আর (স্মরণ কর) আমরা যখন ইবরাহীমের জন্য (কাবা) গৃহের স্থান বানিয়েছিলাম (এবং বলেছিলাম) 'কারো সাথে আমাকে শরীক সাব্যস্ত করো না এবং আমার গৃহকে তাদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখ, যারা এতে তাওয়াফ করবে, (নামাযে) দাঁড়াবে, রুকু করবে, সিজদা করবে। একজন মু'মিনের ওযু বা গোসলের মাধ্যমে বাহ্যিক পবিত্রতার পাশাপাশি ইবাদতের স্থানকেও পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র রাখার কথা বলা হয়েছে। 'আমার গৃহকে পবিত্র রাখ' উক্তি আদেশ এবং ভবিষ্যদ্বাণী উভয়ই প্রকাশ করে। আদেশটি হলো 'কাবা' ঘর মূর্তিপূজার মাধ্যমে কলুষিত না করা। কেননা, এটি নির্মিত হয়েছিল এক-অদ্বিতীয় সত্য-খোদার উপসনার জন্য। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল এই বাস্তব ঘটনার মধ্যে যে, উক্ত আদেশ অমান্য করা হবে এবং আল্লাহ্‌র ঘর মূর্তির ঘরে পরিণত হবে। কিন্তু পরিণামে পুণরায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করা হবে।

কোন কোন বিশেষ অবস্থা, যেমন নামাযের আগে গোসল :–

মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "আর অপবিত্র অবস্থাতেও (নামাযের কাছে যেয়ো না) যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা গোসল করে না নাও" (সূরা নিসা : ৪৪)। সূরা মায়েদাতেও এ ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা উপরে আলোচিত হয়েছে। সাধারণ অবস্থায় 'অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন' হলে গোসলের মাধ্যমে পরিষ্কৃত হয়ে নামায পড়তে হয়। প্রয়োজন মোতাবেক 'তাইয়াম্মুম' এর অনুমতি রয়েছে। উল্লেখিত দু'টি আয়াতেই তাইয়াম্মুম সম্পর্কে বলা হয়েছে। কেউ যদি সফরের অবস্থায় অপবিত্র-অপরিচ্ছন্ন হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে গোসলের পরিবর্তে সে 'তাইয়াম্মুম' করে নামায পড়তে পারে। তাইয়াম্মুম করার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "আর তোমরা পীড়ত বা সফরে থাকলে বা তোমাদের কেউ শৌচকর্ম সেড়ে এলে অথবা তোমরা স্ত্রী গমন করে থাকলে এবং (এসব অবস্থায়) তোমরা পানি না পেলে পবিত্র শুকনো মাটি দিয়ে 'তায়াম্মুম' কর। এ উদ্দেশ্যে তোমাদের মুখমন্ডলে ও তোমাদের হাতে 'মাসহ্' কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম মার্জনাকারী ও পরম ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা : ৪৪)

ইসলাম ধর্ম এমনই একটি সুন্দর ও শান্তির ধর্ম, যা আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। এমন কোন শিক্ষা নেই, যা এতে বর্ণনা করা হয়নি। মানুষের সব বিষয় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের উচিত সেগুলোকে নিজেদের জীবনে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। সবকিছুকে সহজ ভাবে মেনে নেয়া। ইসলাম কখনো গোড়ামীর শিক্ষা দেয় না। আমাদের জীবনকে সুন্দর ভাবে সাজাতে হলে এসকল নিয়ম-নীতির ওপর আমল করা উচিত।

ইসলাম ধর্ম এমনই একটি সুন্দর ও শান্তির ধর্ম, যা আলোচনা করে শেষ করা যাবে না। এমন কোন শিক্ষা নেই, যা বর্ণনা করা হয়নি। মানুষের সব বিষয় পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। আমাদের উচিত সেগুলোকে নিজেদের জীবনে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। সবকিছুকে সহজ ভাবে মেনে নেয়া। ইসলাম কখনো গোড়ামীর শিক্ষা দেয় না। আমাদের জীবনকে সুন্দর ভাবে সাজাতে হলে এসকল নিয়ম-নীতির ওপর আমল করা উচিত।

সফরে থাকাকালীন নামায কসরের অনুমতিঃ

সূরা নিসার ১০৩ নং আয়াতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। কসর নামায সম্পর্কে এখান থেকে আমরা নির্দেশনা নিতে পারি। বিশেষ করে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়, অসুস্থ অবস্থা, বৃষ্টির কারণে অথবা সফরে থাকলে নামায সংক্ষিপ্ত ভাবে আদায় করা যায়। নবী করীম (সা.) এর হাদীস থেকে এ ব্যাপারে জানা যায়। কসর নামাযের ক্ষেত্রে সুন্নত পড়তে হয় না। চার রাকাতের স্থলে দু'রাকাত পড়ার বিধান রয়েছে।

জুমুআর নামাযের বিধিবদ্ধতা :

পবিত্র কুরআনের সূরা জুমুআর ১০নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, "হে যারা ঈমান এনেছ! জুমুআর দিনের একটি অংশে যখন নামাযের জন্য তোমাদেরকে ডাকা হয়, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে দ্রুত এগিয়ে আস এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দাও। তোমাদের জন্য এটাই উত্তম, যদি তোমরা (তা) জানতে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে, যারা নবী করীম (সা.) এর বাণীকে অগ্রাহ্য করেছে এবং নিজেদের 'সাবাত' দিবসকে (সাপ্তাহিক ধর্ম-দিবস) অপবিত্র করে আল্লাহ্ তাআলার ক্রোধভাজন হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তাই মুসলমানদেরকে বিশেষ ভাবে তাগিদ ও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন সাপ্তাহিক জুমুআর নামায আদায় করতে কখনো অবহেলা না করে। প্রত্যেক জাতিরই সাবাত (সাপ্তাহিক ধর্মদিবস) আছে। এই হিসেবে মুসলমানদের 'সাবাত' শুক্রবার। যেহেতু এই সূরাটি প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) এর আগমনকালের সাথে জড়িত, সেইহেতু এখানে জুমুআর নামাযের আহ্বান বলতে মুসলমানদের প্রতি প্রতিশ্রুত মসীহের উদাত্ত আহ্বানকেও বুঝাচ্ছে। কেননা, প্রতিশ্রুত মসীহ্ তাকে গ্রহণ করার জন্য সর্বপ্রথম মুসলমানদেরকেই আহ্বান করবেন।

তাহাজ্জুদ নামায ও এর আদেশ :

তাহাজ্জুদ নামায আদায় সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দেন, "আর রাতের এক অংশেও এর (কুরআন পাঠের) মাধ্যমে তুমি তাহাজ্জুদ পড়। এটা তোমার জন্য নফল (অর্থাৎ অতিরিক্ত অনুগ্রহ) স্বরূপ। আশা করা যায়, তোমার প্রভু-প্রতিপালক তোমাকে এক বিশেষ প্রশংসনীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন' (সূরা বনী ইসরাঈল : ৮০)। এই আয়াতে লিপিবদ্ধ 'নাফেলাতাললাক' এর অন্য অর্থ- 'বিশেষ অনুগ্রহ' এবং তা এই মর্ম ব্যক্ত করেছে যে, নামায ক্লান্তিকর বোঝা নয়, বরং তা সাধকের জন্য সুবিধা এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহের কারণ বিশেষ।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মতো দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এত অধিক বিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহার এবং গালাগালি করা হয়নি এবং নিশ্চিতরূপেই এত ঐশী প্রশংসাও আর কোন মানব পায়নি এবং এত অধিক আশির্বাদ ও অনুগ্রহ বর্ষিত করার জন্য অনুসারীদেরকে দরূদ প্রেরণের পাত্রও অন্য কোন ব্যক্তি হয়নি। নীরব নিথর গভীর রাতে মু'মিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহাজ্জুদ নামায সর্বোত্তম সাধনা। নির্জনে একাকী সে এতে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে গোপনে এক পবিত্র-যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে। সূরা কাফ এর ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, "এবং রাতের এক অংশে তাঁর মহিমা ঘোষণা কর সিজদার পরেও (তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর)"।

সূরা আত্‌তূর এর ৫০নং আয়াতে বলা হয়, "আর রাতেও এবং তারকাদের ডুবে যাওয়ার পরও তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর'।

এ বিষয়ে সূরা মুজাম্মেল এর ৩-৯ আয়াতে বলা হয়েছে, "তুমি রাতের অল্প অংশ বাদে (বাকী সময়টাতে ইবাদতের জন্য) দাঁড়াও, এর অর্ধেক অংশ অথবা এ থেকে কিছুটা কম অংশে, অথবা এর চেয়ে কিছুটা (সময়) বাড়িয়েও (ইবাদতের জন দাঁড়াও)। আর তুমি শুদ্ধরূপে ও সুললিতকণ্ঠে কুরআন পড়ো। আমরা তোমার উপর নিশ্চয় এক গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করবো। (ইবাদতের জন্য) রাতে উঠা (প্রবৃত্তি) দমনে অধিক কার্যকর পন্থা এবং কথায় (প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে) অধিক শক্তিশালী। নিশ্চয় দিনের বেলায় তোমার অনেক কর্ম-ব্যস্ততা থাকে। অতএব তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং (পার্থিব বিষয়াদির দিকে) সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর হয়ে যাও'। নিশীথ রাতে জেগে নামায, দোয়া, ইত্যাদি আত্মশুদ্ধির সাধনা করলে রিপু ও কুপ্রবৃত্তিসমূহ দমন হয় এবং তা নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কার্যকর ভাবে সাহায্য করে। আল্লাহ্‌র পবিত্র বান্দগণের সকলেরই এই একই অভিজ্ঞতা যে, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিশীথ রাতের দোয়া ও নামাযের মত এত কার্যকর পন্থা আর কিছু নেই। গভীর রাতের নীরব-নিভৃত অবস্থায় এক নিগূঢ় প্রশান্তি বিরাজ করতে থাকে। সেই নিস্তব্ধ-নীরবতায় মানুষ একাকী তাঁর স্রষ্টার সঙ্গ লাভ করার মহা সুযোগ প্রাপ্ত হয়। তার আত্মা ঐশী আলোকে আলোকিত ও সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে এবং সেই আলো সে পরে অন্যের কাছে বিলাবারও সুযোগ প্রাপ্ত হয়। এই সময়টা ব্যক্তির চারিত্রিক শক্তি অর্জনের পক্ষে এবং নিজের কথাবার্তাকে যুক্তিপূর্ণ, সার্থক ও প্রভাব-বিস্তার করে তোলার পক্ষে বড়ই উপযোগী। সফল বাক্‌শক্তি ও অদম্য কর্মক্ষমতা এমনই দু'টি গুণ, যা ধর্ম-র্সস্কারকের জন্য অপরিহার্য। জাগরিত রাত্রির প্রার্থনা এই দু'টি শক্তিকে (গুণকে) জাগিয়ে তোলে। এর দ্বারা স্বীয় মনের ওপর, স্বীয় জিহ্বার ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে সবকিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হয়।

সূর আদ দাহ্‌র এর ২৭নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, 'এবং রাতের এক অংশে তাঁর সমীপে সিজদাবনত থাক। আর তুমি রাতে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাক'। পাঠক! নামায কায়েম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মজীদে যে সকল নির্দেশনা দেয়া আছে, তা এ লেখার মাধ্যমে তুলে ধরা হলো এবং নামাযের যাবতীয় নিয়মাবলী, গুরুত্ব ও মাহাত্ম, ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হলো। পাশাপাশি নামাযের ওপর বিস্তারিত একটি চিত্র তুলে ধরতে পারায় আল্লাহ্ তাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। মহান আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে সত্যিকার নামাযী হওয়ার তৌফিক দান করুন, আমীন।

মরহুম কওছার আলী মোল্লা সাহেবের স্মৃতিচারণ-

মোহাম্মাদ আব্দুল আজিজ
ইন্টারনাল অডিটর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।

কওসার আলী মোল্লা

আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ভ্রাতা জনাব কওসার আলী মোল্লা, ন্যাশনাল সেক্রেটারী তরবিয়াত গত ২৮-০৪-২০১৩ইং তারিখ রোজ রোববার ভোর ০৪-০০টায় বারডেম হাসপাতালে হৃদযন্ত্রেরক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন- ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজেউন।

ইন্তেকালের বেশ কিছু দিন পূর্ব হতে তিনি নিজ দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে প্রতি রোববার হুযুর (আই.)-এর বিশেষ তাহরীক পালনের নিমিত্তে বা-জামাত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় ও পরদিন সোমবার নফল রোজা রাখার জন্য দারুত তবলীগ মসজিদে অবস্থান করতেন এবং সবাইকে তা পালনে উৎসাহিত করতেন। এছাড়া নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ, বা-জামাত ওয়াক্তি নামাজ, প্রত্যহ কুরআন শরীফ তেলওয়াত ও জামা'তের পুস্তকাদি পাঠ ছিল তার রুটিন কাজ। বার্ধক্য বয়সেও অসুস্থতা নিয়ে নিয়মিত বকশীবাজার মসজিদে যাতায়াত এবং বাংলাদেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জামা'তের কাজে ছুটে বেড়াতেন। নানান অসুস্থতা থাকা সত্বেও এক সামান্য অযুহাতে তিনি হাসিমুখে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

তিনি যেভাবে চলে গেলেন :- প্রতি দিনের ন্যায় গত ২৪-০৪-২০১৩ ইং তারিখ তিনি প্রাত ভ্রমণে যান। বাসা থেকে ২/৩ কিলোমিটার দুরে মেরাদিয়া বাজারের নিকট রামপুরা থানার কাছাকাছি একটা যাত্রিবাহী মেক্সির চাকা তার পায়ের আংশিক উপর দিয়ে চলে যায়। এতে তার পায়ের তলার চামড়া কয়েক যায়গা ফেটে গিয়ে প্রচন্ড রক্তপাত হতে থাকে এবং তিনি ধাক্কা পেয়ে রাস্তায় পড়ে যান, তবে হাড্ডি ভাঙ্গেনি। পুলিশ গাড়ীর ড্রাইভারকে আটক করে এবং তার ঠিকানা রেখে দ্রুত চিকিৎসার জন্য পরামর্শ দেয়। তিনি সাথে সাথে বাসায় তার ছেলে শরিফ আহমদ সাজুকে মোবাইল করে ডেকে এনে কাছাকাছি এক প্রাইভেট ক্লিনিকে গিয়ে ব্যান্ডেজ করিয়ে রক্ত বন্ধ করিয়ে নেন। যা মন:পুত না হওয়ায় তাকে সাথে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গিয়ে ক্ষত যায়গাটা পরিষ্কার, সেলাই ও ভাল করে ব্যান্ডেজ করিয়ে বাসায় চলে আসেন।

বিষয়টা তিনি মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবকে তখনি অবহিত করে দোয়ার জন্য অনুরোধ করলে তিনি তার জন্য দোয়া করেন এবং সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দেন। এদিকে পুলিশ গাড়ীর ড্রাইভারকে থানা থেকে জনাব কওছার আলী মোল্লা সাহেবের ঠিকানা দিয়ে বলে আহত ব্যক্তির চিকিৎসা খরচ দিয়ে ও তার নিকট থেকে মাফ পেলে তবে তাকে ছাড়া হবে। সন্ধায় ড্রাইভার তার বাবা-মাসহ জনাব কওছার আলী মোল্লা সাহেবের বাসায় এসে তাদের আকুতি জানালে তিনি তাদের মাফ করে দিয়ে তাদের নিকট থেকে চিকিৎসা খরচ নেয়া তো দুরের কথা নিজের ভুলের জন্য তাদের কাছে মাফ চাইতে শুরু করেন। বাসায় খাকসার তাকে দেখতে গেলে তিনি এসব কথাগুলো বলার সময় তাকে উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। যা হোক তিনি ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক দু'দিন পর শনিবার বারডেম হাসপাতালে গেলে ডাক্তার ক্ষত স্থানে রক্ত জমাট বাধায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি হতে বলায় তিনি ভর্তি হয়ে যান। তার শরীরের অবস্থা এত খারাপ ছিল না যে, রাত্রে তার সাথে লোক থাকা প্রয়োজন, তাই তিনি তার ছেলে শরীফ আহমদ সাজুকে বাসায় যেতে বলেন আর মসজিদ থেকে কোন খাদেমের থাকা সম্ভব হলে সে থাকতে পারে বলায় একজন খাদেম মোয়াজ্জিন সুজন তার কাছে রাত্রিতে থাকেন। রাত্রিতে ১২-০০ দিকে হার্টে কিছু সমস্যা মনে হলে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ খেয়ে তিনি নিজেই বাথ রুমে যান, সেখান থেকে এসে বিছানায় শুয়ে পড়েন। ডিউটিরত খাদেম হাসপাতালের বারান্দায় বিছানা করে শুয়ে পড়ে। ভোর ০৪-০০টায় পার্শ্বের রুগী ডিউটিরত খাদেমকে জানায় আপনার রুগি কেমন যেন শব্দ করছেন দেখেন। খাদেম তৎক্ষনাত ডাক্তারের স্বরনাপন্ন হলে ডাক্তার পরীক্ষা করে জানান তিনি বেচে নেই। এভাবেই জনাব কওছার আলী মোল্লা সাহেব আমাদের কাছ থেকে চির বিদায় নিলেন- ইন্নালিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহী রাজেউন।

জীবন বিত্তান্ত:- জনাব কওছার আলী মোল্লা, পিতা-মরহুম আকবর আলী মোল্লা। ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার বাশড়া গ্রামে ঘটিয়ার শরীফ এলাকায় বর্তমান আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাশড়ায় ২৩-০৬-১৯৪৫ইং তারিখ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন জন্মগত আহমদী। তার পিতা- আকবর আলী মোল্লা সাহেব ***১৯৪৫ সন বা এর সমসাময়িক সময়ে*** আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। জনাব কওছার আলী মোল্লা তালদি এম সি হাই স্কুলে পড়া লেখা করেন এবং কলেজ জীবন কাটান কোলকাতার বঙ্গবাশি কলেজে।

সেখান থেকে তিনি ১৯৬২ সনে বি-এসসি ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি একাধিক চাকুরীতে যোগ্য বিবেচিত হয়েও মুসলমান হওয়ার কারনে নিয়োগ পত্র না পাওয়ায় ভারতে পড়া লেখা বা চাকুরী করার প্রতি আগ্রহ হারাতে থাকেন। তেমনিভাবে তাদের বেশ কিছু ভুসম্পত্তি ভারতীয় সিপিএম দলের নেতাদের দ্বারা জবর দখল, বাড়ীতে অহরহ চুরি, ডাকাতিসহ নানান কারনে অতিষ্ট ও আতংকগ্রস্থ হয়ে পড়তে থাকেন।

কর্ম জীবন:- ১৯৬৮ সনের প্রথম দিকে তিনি বাংলাদেশের সুন্দরবন জামা'তে আসেন এবং ০১-০৬-১৯৬৮ তারিখে সুন্দরবন হাই স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। পাশাপশি তিনি তাদের পৌত্রিক ভুসম্পত্তি ভারত থেকে বাংলাদেশে বিনিময়ের চেষ্টা করতে থাকেন। সেই সময়ে মরহুম সামসুর রহমান সাহেব টি.কে এবং শেখ জোনাব আলী সাহেবের স্নেহধন্যে এবং জনাব এস.এম আবু কওছার সাহেবের সাহোচার্যে তিনি অল্প দিনের মধ্যে স্কুলের এবং এলাকায় সকলের কাছে গ্রহনীয় ও বরেন্য ব্যক্তি হিসেবে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তিনি ১৯৬৮ সনে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রিয় সালানা জলসা যা জামা'তের কেন্দ্র রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত হয় তাতে অংশ গ্রহণ করে হযরত আমিরুল মোমেনিন খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) এর সাক্ষাত লাভের সুযোগ পান।

আদর্শ শিক্ষক এবং ভাল একজন বক্তা হিসেবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তিনি ভালো ফুটবল, ভলিবল ও ব্যাডমিন্টন খেলতেন এ ছাড়াও তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। ছাত্রদের পড়া লেখা শিখানোর পাশাপশি তিনি তাদের সাথে নিয়মিত বন্ধুর মত খেলতেন। স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সকলে তাকে খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে ***বি-এসসি স্যার*** বলেই সম্বোধন করতো।

তিনি ০৯-০২-১৯৭৭ইং তারিখ পর্যন্ত সুন্দরবন হাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। এরপর তিনি ১৪-০২-১৯৭৭ইং তারিখ গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গন-সংযোগ বিভাগে চাকুরী পেয়ে তাতে যোগদান করেন। চাকুরী জীবনের প্রথম কর্মস্থল ছিল পিরোজপুর জেলা অত:পর হবিগঞ্জ, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, খুলনা সদর, সাতক্ষীরা ও নড়াইল জেলায় চাকুরী করেন। জেলা তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে অত্যন্ত সুনাম ও সফলতার সাথে কর্মজীবন শেষ করে ২৩-০৬-২০০২ইং তারিখ অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জামা'তে দায়িত্ব পালন ছাড়াও উল্লেখযোগ্য যে সকল দায়িত্ব পালন করেন তা হলো- মজলিস আনসারুল্লাহ খুলনার জয়িম আলা ২৮-০৯-৯৭ হতে ২৭-০৪-৯৮ইং তারিখ পর্যন্ত। খুলনা জামা'তের সেক্রেটারী তরবিয়ত ও উমুরে আমা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২০-১১-৯৮ হতে ১০-০৯-৯৯ পর্যন্ত। একই সাথে তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের বৃহত্তর খুলনার রিজিওনাল নাযেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এপ্রিল-১৯৯৮ হতে ডিসেম্বর ২০০১ পর্যন্ত। এ সময় তিনি ওসীয়্যত করেন।

তিনি আল্লাহ্ তাআলার অপার অনুগ্রহে ও অনেকের দোয়া ও চেষ্টায় তার পিতা মাতাসহ দু-ভাই জনাব আহমদ আলী মোল্লা ও ডা: আক্তার হোসেন সাহেব ও নিজ পরিবারের সকল সদস্য সদস্যাকে ১৯৭৩ সনে সুন্দরবন জামা'ত এলাকায় বসবাসকারী এক হিন্দু পরিবারের সাথে সম্পত্তি বিনিময় করে ভারত থেকে বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে চলে আসতে সক্ষম হন।

তিনি ২০০২ সনে সরকারী চাকুরী জীবন থেকে অবসর নিয়ে একই বছরে ঢাকা চলে আসেন এবং একটা ছোট্ট বাসা ভাড়া নিয়ে অবসর জীবনটা জিন্দেগী ওয়াকফকারীর ন্যায় অতিবাহিত করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের নায়েব সদর একই সাথে তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত ন্যাশনাল জামা'তের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবেও বাংলাদেশ জামা'তে খেদমত করার সৌভাগ্য লাভ করেন।

পারিবারিক জীবন:-জনাব কওছার আলী মোল্লা সাহেব ১৯৬১ সনে বিবাহ করেন মিসেস কস্তুরী নাহার বেগম সাহেবাকে, যিনি ভারতের চব্বিশ পরগানা জেলার বারাশাত এলাকার অধিবাসী। তিনি ২-ছেলে এবং ১-মেয়ে শাহনাজ পারভিন নীনা এবং তার জামাই ও ২-নাতনী এছাড়া তিনি বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধব রেখে যান। তার বড় বোন ও ভগ্নিপতি এবং তাদের পরিবার বর্তমানে ভারতে বসবাস করেন। আল্লাহ্ তাআলার ফজলে প্রায় সকলেই জামা'তের সক্রিয় খেদমতে নিয়োজিত আছেন। মরহুম কওছার আলী মোল্লার প্রথম জানাজা মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের ইমামতিতে বকশীবাজারস্থ কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গনে রবিবার বাদ যোহর অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বিতীয় জানাজা সুন্দরবন জামা'তে পরদিন সোমবার সকাল ০৮-০০টায় অনুষ্ঠিত হয়। সুন্দরবন জামা'তের মোহতরম আমীর সাহেবের তত্ত্বাবধানে জামা'তের গোরস্থানে যেখানে তার মরহুম পিতা মাতার কবর বিদ্যমান সেখানে মরহুমকে মুসীদের সারিতে দাফন করা হয়। মরহুমের রুহের মাগফেরাত এবং তার শোক সন্তপ্ত পরিবারের সদস্য সদস্যাদের জন্য শান্তনা কামনা এবং জামা'তে তার অভাবে যে কর্মী শুন্যতা সৃষ্টি হয়েছে তা পুরনের লক্ষ্যে সকলের নিকট খাস দোয়ার অনুরোধ জানচ্ছি- আমীন।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে

'পাক্ষিক আহমদী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ'

শতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে 'পাক্ষিক আহমদী'র আগামী ৩০ জুন-২০১৩ সংখ্যাটি বিশেষ কলেবরে প্রকাশ করা হবে, ইনশাআল্লাহ। এ সংখ্যায় বাংলাদেশে আহমদীয়াত প্রতিষ্ঠার সূচনা ও বিস্তারের ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর নিবন্ধ, সচিত্র তথ্যাদি উপস্থাপন করা হবে।

বন্ধু, সুহৃদ, পাঠক ও লেখকগণের কাছ থেকে এ সম্পর্কিত লেখা, তথ্য ও আলোকচিত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

আগামী ৩১ মে-২০১৩ এর মধ্যে এ সম্পর্কিত নিবন্ধ, লেখা ও আলোকচিত্র সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী'র বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল।

- সম্পাদক

প্রথম বাঙালি শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনি

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১২তম কিস্তি)

মোহাম্মদ ওসমান গনি

দু'জন শহীদের স্মরণে জলসা

পূর্ব পাকিস্তানের জামাতে শাহাদত দিবস পালন করা হচ্ছে। কিন্তু এটা কোন রুসুম রীতি অনুসারে নয়। আজ থেকে এক বছর পূর্বের ঘটনা। ৪ নভেম্বরে (১৯৬৩) ব্রাহ্মণবাড়িয়া সালানা জলসার দিনে সন্ধ্যায় ভাই ওসমান গনি ও ভাই আব্দুর রহিম শহীদ হয়ে ছিলেন। আজ ঐ দুই শহীদের জীবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকগুলো বিভিন্ন বক্তৃতায় ফুটে উঠেছে।

প্রাদেশিক আমীর হযরত মৌলবি মোহাম্মদ সাহেব হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) এর একটি স্বপ্নের উল্লেখ করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে শাহাদতের এই ঘটনা পূর্বেই উর্ধ্বলোকে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল। বাংলার জামাতকে জাগ্রত করাই এই ঘটনার উদ্দেশ্য ছিল।

মোকামী আমীর লতিফ আহমদ তাহের সাহেব স্পষ্ট ভাষায় বলেন, এমন মহান কুরবানী কোথাও হঠাৎ করে হয় না। যদি গভীর দৃষ্টি দেয়া হয় তাহলে দেয়া যায়, মু'মিন ছোট ছোট কুরবানী করতে করতে শাহাদতের স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বস্তুত মু'মিন ছোট ছোট আর্থিক কুরবানী করতে করতে এই মহান সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

মৌলবি মোস্তফা আলী সাহেব শাহাদতের এই ঘটনাকে এক নতুন আলোয় ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক জীবের দৈহিক মৃত্যু আবশ্যকীয়। জড় পদার্থের মৃত্যু নেই। শুধুমাত্র ধীরে ধীরে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, তাই তারা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে খোদার রাস্তায় কুরবানী করে দ্বিতীয়বার চিরস্থায়ী জীবন লাভ করে।

মানুষ হাজার চেষ্টা করলেও কুরবানী করতে পারে না। তার সম্পদ, তার আরাম আয়েশ, ইচ্ছা-আকাঙ্খা সে একান্ত বাধ্য হয়ে কুরবানী করে থাকে। কিন্তু তার দৃষ্টি সব সময়ই কোন কিছু অর্জনের দিকে নিবদ্ধ থাকে। এটা থেকে বুঝা যায়, শাহাদতের মত মূল্যবান অন্য কিছু নেই। এটা মানুষ শুধুমাত্র প্রাণের কুরবানীর মাধ্যমেই অর্জন করতে পারে। আর খোদা তাআলার সমীপে তার সত্তার সাক্ষ্য অথবা শহীদ হয়ে সে বাকী জীবন লাভ করে।

মামলা/মোকদ্দমা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর শীষ্যত্ব গ্রহণকারী নিরপরাধ লোকদের উপর বর্বর হামলায় নৃশংস হত্যাকান্ডের ঘটনায় শান্তিপ্রিয় আহমদীরা সুবিচারের প্রত্যাশায় আইনের আশ্রয় নেই। এর নেতৃত্বদানকারী মৌলবি তাজুল ইসলাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া কান্দিপাড়ার গাজীউর রহমান, মেড্ডার ডা: শামসুদ্দিন আহমদসহ অনেককে আসামী করে থানায় ও কোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলায় বাদী স্থানীয় মজলিসের কায়েদ ফরিদ আহমদসহ কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা উল্টা ২৩ জন আহমদীকে আসামী করে ঘটনার দিন রাতেই আহমদীদের মামলা করার পূর্বে থানায় এবং পরে কোর্টে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। আহমদীরা ভয়ে ঘটনার দিন রাতে ঘর থেকে বের হয় নি এবং থানায় যান নি। কেননা তখন থানা পুলিশ তাদের আশীর্বাদপুষ্ট ছিল। তাদের মামলার নম্বর ছিল–পিএস কেস নং-৫ (১১) ৬৩ জি আর কেস নং ৭৯১/৬৩। তাদের মোকদ্দমায় আহমদী আসামীরা হলেন–

(১) ফারুক আহমদ, (২) সৈয়দ এজাজ আহমদ (৩) গোলাম সামদানী খাদেম (৪) সলিম উল্লাহ্ (৫) আনোয়ার হোসেন (৬) সাহেব আলী (৭) সৈয়দ মোবাশ্বের আহমদ (৮) সৈয়দ সালেহ আহমদ (৯) ফরিদ আহমদ (১০) জারু মিয়া (১১) বশির আহমদ (১২) সাদির খান (১৩) মুমিন খান (১৪) আজিজ খান (১৫) আব্দুস সামাদ মিয়া (১৬) আব্দুল আলিম (১৭) ফকরুল ইসলাম (১৮) মীর আব্দুর রাজ্জাক (১৯) সোনা মিয়া (২০) ইকবাল খান (২১) আলী আহমদ লস্কর (২২) আব্দুল আউয়াল এবং (২৩) আহমদ তৌফিক চৌধুরী।

একবার বিরুদ্ধবাদীদের কয়েকজন আহমদীয়া জামাতের প্রবীন সদস্য আব্দুল আউয়াল (মনু মিয়া) আনন্দবাজারস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আহমদীদেরকে মামলা নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার হুমকি

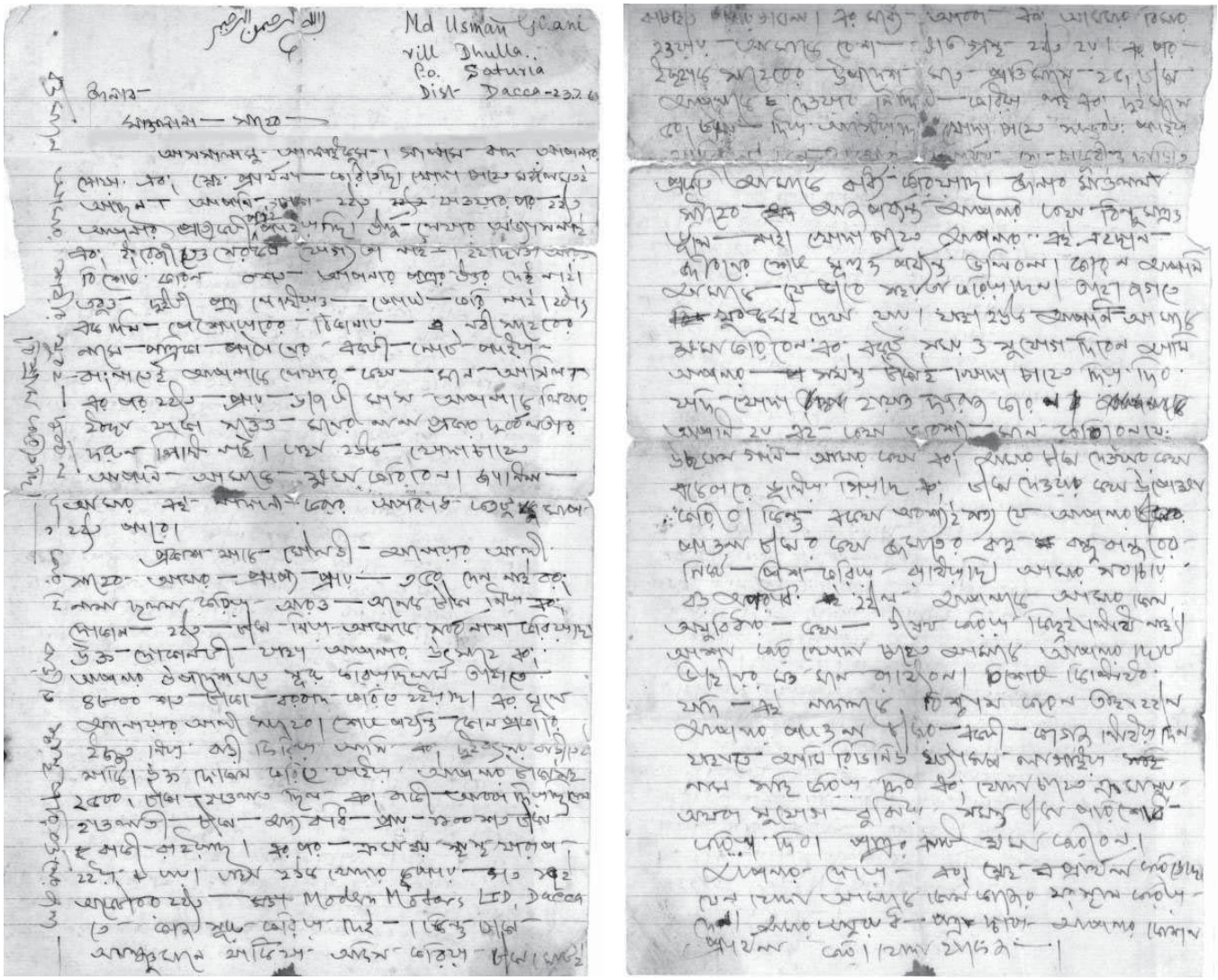

শহীদ মোহাম্মদ ওসমান গনির লেখা একটি পত্র

দেয়। তাদের দায়েরকৃত মামলার আর্জিতে উল্লেখ ছিল–কাদিয়ানীরা (আহমদীরা) হযরত রসূল করীম (সা.)কে অবমাননা করে বক্তব্য দেন (নাউযুবিল্লাহ্) এটা তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে। তাই তারা বাধা দিতে গেলে আহমদীরা তাদের উপর আক্রমণ করে। ফলে সংঘর্ষ হয়। তখন স্থানীয় প্রশাসনের উপর বিরুদ্ধবাদীরা এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, আক্রমণের সময় থানায় খবর দিলেও পুলিশ আসেনি। পরে পুলিশ আসে নিরব দর্শকের মত। এমনকি ব্রাহ্মণবাড়িয়া বারের কোন অ-আহমদী উকিল আহমদীদের পক্ষে কাজ করতে সম্মত হয়নি। তাই কুমিল্লা থেকে সতীশ চন্দ্র দে নামে এক উকিলকে আনা হয়। তার সাথে আমাদের জামাতের ছিলেন স্থানীয় উকিল গোলাম সামদানী খাদেম, ঢাকার ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান এবং সন্দ্বীপের জাহিদ হোসেন মোক্তার। এই জাহিদ হোসেন মোক্তার ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক সেনাদের হাতে নিহত হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া কোর্টে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে উকিল ছিলেন রেহান উদ্দিন এবং হাকিম ছিলেন খাজা আব্দুল হালিম।

৩১ জুলাই ১৯৬৫ তারিখ মোকদ্দমা কুমিল্লা সেশন জজকোর্টে সোপর্দ করা হয়। কুমিল্লার এডিশনাল জজ চট্টগ্রামের মফিজুল হকের এজলাসে বিচারকার্য চলে। ১৩ জুন ১৯৬৬ তারিখ মামলা খালাস হয়। ফলে তাদের নির্মম হত্যাকান্ডের তান্ডবলীলায় দুইজন নিরপরাদ মানুষ নিহত হলেও এর সুবিচার পাওয়া যায়নি। বরং বিরুদ্ধবাদীরা আহমদীদেরকে মিথ্যা মামলায় ফাসায়ে শাস্তি দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তবে দুনিয়াবী এর সুবিচার পাওয়া না গেলেও আল্লাহ্ তাআলার নিকট থেকে এ কুরবানীর পুরস্কার এবং বিরুদ্ধবাদীদের শাস্তি অনিবার্য। কেউ রুখতে পারবে না। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিদান দেয়া হয়। আর তাদের প্রতি অবিচার করা হবে না (সূরা আল্ জাসিয়াহ ৪৫ :২৩)। মিথ্যাবাদী ও অতি অকৃতজ্ঞকে আল্লাহ্ কখনও হেদায়াত দেন না (সূরা আয্ যুমার ৩৯ : ৪)।

(চলবে)

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ ভর্তি পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ-এ ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৮ম ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে।

আগামী ০১/০৬/ ২০১৩ তারিখের মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, ৪নং বকশি বাজার, রোড ঢাকা বরাবর পৌঁছুতে হবে।

আগামী ১৪, ১৫. ১৬ জুন ২০১৩ তারিখে ভর্তি-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। ***এজন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই ১৩ জুন ২০১৩ তারিখ বিকাল ৫.০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।***

আবেদনকারীর যোগ্যতা নিম্নরূপ ঃ

(১) এস.এস.সি/এইচ.এস.সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে।

(২) এ বছর এইচ.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস.এস.সি-তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে।

(৩) ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(৪) সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস.এস.সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ.এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর।

(৫) ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ওয়াকফে নও অগ্রাধিকার পাবে।

(৬) কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি-বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে।

(৭) জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে।

(৯) আরবী, উর্দ্দূ ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

(১০) বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বছর অতিক্রান্ত হতে হবে এবং এই তিন বছর জামা'তের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী হতে হবে।

(১১) আবেদনকারীকে অবশ্যই খোদ্দামুল আহমদীয়ার স্থানীয় হতে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের তালিম-তরবিয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণকারী হতে হবে।

(১২) ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে।

(১৩) আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে- অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামা'তের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতগ্রহণকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেট এর সত্যায়িত ফটো কপি (চ) নিজ হস্তে আবেদন পত্র লিখতে হবে। (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সত্যায়ন থাকতে হবে (জ) জামা'তি, মজলিসি চাঁদা পরিশোধ রয়েছে মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নাযেম মালের সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ-যোগ্যতা থাকলে তা-ও উল্লেখ করতে হবে (ট) জামা'তের এমন দু'জন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে, যিনি আবেদনকারী সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামা'তের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবিত) এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে, তা উল্লেখ করতে হবে।

বি. দ্র. প্রত্যেক স্থানীয়-জামা'তে একাধিক জুমুআর দিনে সার্কুলারটি এলান করতে এবং নোটিশ বোর্ডে প্রদর্শন করতে অনুরোধ করছি।

প্রয়োজনে যোগাযোগ: মোবাইল নম্বর ০১১৯১৩৬৩৪১৮, ০১৬৭৭৪৮৬৩৫৯ অথবা ০১৭৫৫৫৬৫৩০৯, ০১৯২২০২৪৫৯১।

সেক্রেটারী
বোর্ড অব গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

নবীনদের পাতা-

কেবল মাত্র খোদা তাআলাই খলীফা মনোনিত করেন

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী (সা.)-এর ধারাবাহিকতায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম রয়েছে। এই খেলাফত যেহেতু ঐশী খেলাফত তা কেয়ামত পর্যন্ত এর কল্যাণের ধারা বহমান থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। খেলাফত সম্পর্কে হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণ বিভিন্ন সময় মূল্যবান কথা ব্যক্ত করেছেন, নিম্নে সে সব থেকে সামন্য কিছু তুলে ধরছি জামা'তের বই-পুস্তকের আলোকে।

ইসলামী খেলাফত সম্পর্কে এ যুগের প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, "অতএব হে বন্ধুগণ যেহেতু আদিকাল হতে আল্লাহ্ তাআলার বিধান এটাই যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীগণের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান, সুতরাং এখন এটা সম্ভবপর নয় যে, খোদা তাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এ জন্যে আমি তোমাদেরকে যে কথা বলেছি তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের অন্তর যেন উৎকণ্ঠিত না হয়, কারণ তোমাদের জন্যে দ্বিতীয় কুদরত (আল্লাহর শক্তি ও মহিমা) দেখাও প্রয়োজন এবং এর আগমন তোমাদের জন্যে শ্রেয়। কেননা, এটা স্থায়ী, যার ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। সেই দ্বিতীয় কুদরত আমি না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারে না। কিন্তু আমি যখন চলে যাব, খোদা তখন তোমাদের জন্যে সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা চিরকাল তোমাদের সঙ্গে থাকবে...সুতরাং তোমাদের জন্যে আমার বিচ্ছেদ–দিবস উপস্থিত হওয়া আবশ্যম্ভাবী, যেন এর পর সেই দিন আসে যা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিন।

আমাদের সেই খোদা প্রতিশ্রুতি পালনকারী, বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী খোদা। তিনি তোমাদেরকে সবকিছুই দেখাবেন যা তিনি অঙ্গীকার করেছেন। যদিও বর্তমান যুগ পৃথিবীর শেষ যুগ আর বহু বিপদাপদ রয়েছে? যা এখন অবতীর্ণ হওয়ার সময়। তবুও সেই সমুদয় বিষয় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ দুনিয়া অবশ্যই কায়েম থাকবে, যার সম্বন্ধে খোদা সংবাদ দিয়েছেন। আমি খোদার তরফ থেকে এক প্রকার কুদরত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছি। আমি খোদার মর্তিমান কুদরত। আমার পরে আরও কতিপয় ব্যক্তি হবেন যারা দ্বিতীয় বিকাশ হবেন। অতএব তোমরা দ্বিতীয় কুদরতের অপেক্ষায় সমবেতভাবে দোয়া করতে থাকো। প্রত্যেক দেশে নিষ্ঠাবানদের জামা'তের সমবেতভাবে দোয়ায় নিয়োজিত থাকা বাঞ্ছনীয় যেন দ্বিতীয় কুতরত আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয় এবং তোমাদেরকে ইহাও দেখানো হয় যে, তোমাদের খোদা কত মহা পরাক্রমশালী। স্বীয় মৃত্যুকে সন্নিকট জানবে, তোমরা জান না যে, সেই মুহূর্ত কখন উপস্থিত হবে। জামা'তের পবিত্রচেতা বুজুর্গগণ আমর পরে আমার নামে লোকদের বয়আত (দীক্ষা) নিবেন। খোদা তাআলা চাচ্ছেন যে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে, তারা ইউরোপেই বাস করুক বা এশিয়াতেই বাস করুক, তওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং তাঁর ভক্ত–দাসদেরকে এক ধর্মে একত্র করেন। এটাই খোদা তাআলার অভিপ্রায় আর এজন্যই আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি। সুতরাং তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর; কিন্তু বিনম্র ব্যবহার, নৈতিক উৎকর্ষ ও দোয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ সহকারে। যে পর্যন্ত কেহ রূহুল কদ্দুস বা পবিত্রআত্মা প্রাপ্ত হয়ে দন্ডায়মান না হয় (সে পর্যন্ত) সকলেই আমার পরে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাক" (আল্ ওসীয়্যত পুস্তক, পৃঃ ১৫-১৭ বাংলা সংস্করণ)।

হযরত আলহাজ্ব হেকিম নূরুদ্দীন (রা.) ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফা খেলাফত সম্পর্কে বলেন, "হযরত সাহেবের (হযরত মসীহ মাওউদ আ.)-আল্ ওসীয়্যতে সূক্ষ্ম দিব্যজ্ঞান আছে, যা আমি তোমাদের পরিষ্কার করে বলছি। যাকে খলীফা করা হবে তার বিষয়টি খোদার কাছে সোপর্দ করা হল। আর এ দিকে চৌদ্দ ব্যক্তিকে (যারা আঞ্জুমানে আহমদীয়া সদস্য ও ট্রাষ্টি ছিলেন) বলা হল, তোমরা সমন্বিতভাবে পদাধিকার বলে মসীহ্ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মাওউদ (আ.)-এর খলীফা। তোমাদের সিদ্ধান্ত। আর সরকারের কাছেও তা সঠিক। আর ১৪ জনের সবাইকে বেঁধে বয়আত করিয়ে দেওয়া হল যে, একে খলীফা স্বীকার কর। এভাবে তোমাদের একত্রিত করে দেয়া হয়েছে। কেবলমাত্র ১৪ জনের নয়, বরং সমগ্র জাতি তোমার খেলাফতের ওপর একত্রিত হয়েছে, যারা ঐক্যমত্যের বিরোধী তারা খোদাত াআলার বিরোধী" (হায়াতে নূর -৩৯০ পৃঃ)।

তিনি (রা.) আরো বলেন, "আমি কুরআন হাতে নিয়ে আর খোদা তাআলার কসম খেয়ে বলছি, আমার পীর হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই, আর ছিল ও না এবং কোনরূপেও ছিলনা। খোদা তাআলার ইচ্ছা কে জানে। তিনি যা চেয়েছেন করেছেন। তোমাদের সবাইকে আমার হাতে একত্রিত করেছেন। তোমাদের মধ্যে কেউ নয় কেবল তিনিই আমাকে খেলাফতের পোশাক পরিয়েছেন। আমি তার ইজ্জত ও সম্মান করা আমার কর্তব্য মনে করি" (হায়াতে নূর পৃঃ ৫২৬)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, মুসলেহ মাওউদ (রা.)-বলেন: "আমি এরূপ ব্যক্তিকে, যাকে খোদা তাআলা তৃতীয় খলীফা মনোনীত করবেন, এখন থেকেই সুসংবাদ দিচ্ছি যে, যদি তিনি খোদা তাআলার উপর ঈমান নিয়ে দাঁড়ান তাহলে...যদি দুনিয়ার শাসনাকর্তাগণও তাঁর সাথে মোকাবেলা করে তাহলে তারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে" (বক্তৃতা জলসা সালসা, ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯৫৬ ইং)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) আরো বলেন, "যাকে খোদা তাআলা খলীফা মনোনীত করে, কেউ তাঁর কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁকে এক শক্তি ও সৌভাগ্য দেওয়া হয়। আর তাঁর প্রকৃতির মধ্যে বিজয় ও কৃতকার্য রাখা হয়" (আল ফযল, ২৫ মার্চ, ১৯১৪)।

তিনি (রা.) আরো বলেন, তোমাদের নাম আনসারুল্লাহ্ অর্থাৎ খোদা তাআলার সাহায্যকারী। তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার নামের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা অনাদি ও চিরন্তন। এজন্য তোমাদের চেষ্টা করা উচিত চিরন্তনত্বের প্রকাশস্থল হয়ে যাওয়া। তোমাদের আনসার হওয়ার আলামত অর্থাৎ খেলাফতকে সব সময়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখা। আর চেষ্টা কর যেন এ কাজ বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে। এর দু'টি উপায় আছে। একটি উপায় হল নিজের সন্তানদের সঠিকভাবে তরবিয়ত কর। আর তাদের মধ্যে খেলাফতের মহব্বত কায়েম করা। এজন্য যদি আতফালুল আহমদীয়ার তরবিয়ত সঠিক হয়, তবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরবিয়তও সুষ্ঠু হবে। খোদ্দামুল আহমদীয়ার তরবিয়ত যথার্থ হলে, আনসারুল্লাহর পরবর্তী প্রজন্ম উত্তম হবে" (সাবিল ইরসাদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ২৩)।

খেলাফতের ব্যবস্থাপনা নবুওয়তে ব্যবস্থাপনার অংশ ও পরিশিষ্ট। নবুওয়তের সেবা ও এর পূর্ণতা দেয়ার জন্য এর প্রতিষ্ঠা করা হয়। আল্লাহ্ তাআলা এ সম্পর্কে কুরআন শরীফে নিম্নলিখিত আয়াতে এরূপ নিদর্শন বর্ণনা করেন যাতে সত্য খেলাফতকে মিথ্যা খেলাফতের ওপর দিবালোকের মত নির্বাচিত করে দেয়। "আল্লাহ্ সৎকর্মশীল মু'মিনদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন (এ অর্থ নয় যা সব সৎকর্মশীল মুমিন খলীফা হবেন বরং যিনি খলীফা হবেন তিনি অবশ্যই সৎকর্মশীল মু'মিন হবেন) যেভাবে পূর্ববর্তীদের মাঝে খলীফা নিযুক্ত করেছেন। তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দীনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। (কারণ সব পরিবর্তনের সময় ভয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়) তিনি তাদের ভয়ের অবস্থাকে নিরাপত্তায় পরিবর্তন করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে আমার সাথে কারো শরীক করবে না। এরপর যারা অস্বীকার করবে তারা হবে দুষ্কর্মকারী" (সূরা নূর ঃ ৫৬ আয়াত)।

হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.) ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.)-বলেন, "আগামী এক বছর যা আমাদের জীবনের বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ সময়- কঠিন সময়ও একদিক থেকে। কিন্তু নিজ আঁচলের মধ্যে এতই রহমত সংগ্রহ করে নিয়েছে যে, অনুমানই করা যায় না। এ জন্যে প্রত্যেক বস্তুকে ভুলে গিয়ে...এমনই এক জীবন অতিবাহিত করো আর তা হলো ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে যে অভিযান চলছে তাকে সফলতা দান করা...একব্যক্তি নয় সমস্ত গোষ্ঠি (আর গোষ্ঠির সমষ্টিই জামা'ত ও জাতি সৃষ্টি করে) ঐক্যবদ্ধ হয়ে সর্বাত্মক প্রচষ্টা চালাও...একটি উদ্দেশ্যই আমাদের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে (তা এই যে) খোদা তাআলার প্রেমে আর নবী করীম (সা.)-এর ভালোবাসায় মত্ত হয়ে একই উদ্দেশ্য সাধনে অর্থাৎ আমরা সারা দুনিয়াকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পতাকার নীচে সমবেত করবো।" (বক্তৃতা জলসা সালানা, ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৮১)।

তিনি অন্য আর এক প্রসঙ্গে বলেন, "১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ এ সময়ের মধ্যে খোদা তাআলা দুনিয়াকে এরূপ এক আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ দেখাবেন যা দ্বারা ইসলামের বিশ্ব-বিজয়ের চিহ্ন সুপ্রকাশিত ও সুস্পষ্ট হয়ে যাবে" (আল ফযল, ৮ আগস্ট, ১৯৭৩)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-আরো বলেন, "একদিন আসবে লোকেরা অবাক হবে আর দেখবে খোদাতাআলার কায়েম করা সিলসিলাতে কত বড় শক্তি ছিল। বাহ্যিক ভাবে যাদের দুর্বল দেখা যে, অর্থহীন, সাহায্যহীন, পার্থিব সম্মানহীন, সবদিক থেকে তাড়া খাওয়া, অসম্মানিত এবং যে সিলসিলাকে পৃথিবীর লোকেরা পায়ের নিচে পৃষ্ঠ করতে চেয়েছিল, আল্লাহ্ তাআলার ফযল তাকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে" (হায়াতে নূর, পৃঃ ৩৬০)।

হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-২২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ ইং জুমুআর খুতবায় বলেন, "আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) -এর আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁর পর খেলাফতের নেযাম (ব্যবস্থাপনা) চালু হয়েছে। এই নেযাম (খেলাফত ব্যবস্থা) সব মানুষকে উম্মতে মুহাম্মদীয়া বানাবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে" (দৈনিক আল ফযল, রাবওয়াহ্ ২৬ মে-২০০০)।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) খেলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরদিন ১১ জুন, ১৯৮২ ইং তারিখে প্রথম জুমুআর খুতবায় বলেন, "খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য তৌহীদ প্রতিষ্ঠা করা। আল্লাহ্ তাআলার এই প্রতিশ্রুতি অপরিবর্তনীয় অটল প্রতিশ্রুতি। কখনও এর বিপরীত হতে পারে না। কখনও এর কোন পরিবর্তন হবে না। খেলাফতের চূড়ান্ত ফলাফল এই, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে। আজ আহমদী জামা'তের এই যে অবস্থান অন্য কোন জামাত এর ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না" (আল ফযল, রাবওয়াহ, ২২ জুন, ১৯৮২ ইং)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেন, "খেলাফত প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য হলো জগতে আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা। আর আল্লাহ্ তাআলার অটল, অনড় অপরিবর্তনযোগ্য এ অঙ্গীকার বিদ্যমান খেলাফতের পুরুস্কার প্রদানের পর তোমাদেরকে এই পুরুস্কার দেয়া হবে। তোমরা আমার ইবাদত করবে আর আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না, পূর্ণ একত্ববাদের অনুসারী হয়ে তোমরা আমার ইবাদত করে যাবে আর গুণকীর্তন করতে থাকবে। এই সেই শেষ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি যা আহমদীয়া জামা'তকে প্রদান করা হয়েছে। আর আমি নিশ্চিত, আর আমরা যেসব দৃশ্য অবলোকন করেছি যার ফলশ্রুতিতে আমাদের মনে বেদনাধারার সমান্তরালে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসার ধারাও বয়ে চলেছে। এসব দৃশ্য এত অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক যা জগতের অন্য কোন জাতির মাঝে কল্পনাও করা যায় না! এবিশ্বে আহমদীয়া জামা'তের যে অবস্থান ও মর্যাদা রয়েছে তা অন্য কোন দলের নেই।

অতএব জামা'ত যদি দৃঢ়তা ও বিশ্বস্ততার সাথে নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে আল্লাহ্ তাআলার এ অঙ্গীকার আমাদের সাথে আজীবন বিশ্বস্ততা রক্ষা করে যাবে। আহমদীয়া সগৌরবে সেই 'পবিত্র বৃক্ষের' মত গগনচুম্বী ডানপালা মেলে বেড়ে উঠবে"।

তিনি (রাহে.) আরো বলেন, "আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, আল্লাহ্ তাআলা আপনাদেরকে এ নিয়ামত প্রদান করেছেন অথচ আপনারা কীভাবে এর ভাগী হলেন তা-ও জানতেন না। হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) -এর মাধ্যমে আপনারা পুনরায় এ নিয়ামত লাভ করেছেন, তাই এ নিয়ামতকে স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তাআলা নিজ অনুগ্রহে এ নিয়ামত আবার অবতীর্ণ করেছেন। আর ঐশী নিয়ামত ছাড়া মানুষের মাঝে আত্মার বন্ধন সৃষ্টি করা যায় না। আপনারা যদি আপনাদের মন থেকে হযরত সমীহে মাওউদ (আ.) -এর অস্তিত্বকে মুছে দেন তাহলে আপনাদের কেউই অপরের কোন পরওয়া করবে না। খেলাফত এ সম্পর্কটিকেই আরও সুদৃঢ় করে চলেছে। এ সম্পর্ক প্রথমে খেলাফতের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয় তারপর বিস্তৃতি লাভ করে। অতএব আপনাদের ঐক্যবদ্ধ করার সেই ঐশী অনুগ্রহ

আজ আরেকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে"। (পাক্ষিক আহমদী, ৩০ এপ্রিল ২০০৩)।

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)- বলেন, "স্মরণ রেখো, তিনি সত্য প্রতিজ্ঞা পালনকারী খোদা। তিনি আজও তাঁর প্রিয় মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রিয় জামা'তের উপর নিজ হাত প্রসারিত করে রেখেছেন। তিনি কখনই আমাদের পরিত্যাগ করবেন না। তিনি আজও তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করে যাচ্ছে। যে প্রতিজ্ঞা তিনি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাথে করেছেন। যেমন পূর্বের খলীফাদের যুগে তিনি করেছেন। তিনি আজও সেইভাবেই নিজ রহমত এবং ফযল করছেন যেমন ইতিপূর্বে করেছেন। তিনি ভবিষ্যতেও পূর্ববৎ রহমত ও ফযল করবেন, ইনশাআল্লাহ্! তবে প্রয়োজন একটাই। কেউ যেন আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশাবলীর উপর আমল করা থেকে বিরত না হয় এবং হোঁচট না খায় এবং নিজের পরকাল নষ্ট না করে বসে"। (জুমুআর খুতবা, ২১ মে ২০০৪ ইং)।

খেলাফতে খামেসার (পঞ্চম খলীফার) আনুষ্ঠানিক আন্তর্জাতিক বয়আতের প্রাক্কালে জামা'তের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন, "আমদের হৃদয় আজ দুঃখে ভারাক্রান্ত, চোখ অশ্রুসিক্ত। এক মহানুভব স্নেহশীল ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। কিন্তু আমরা এ ঐশী সিদ্ধান্তকে নত শিরে গ্রহণ করছি। 'কুল্লু মান আলায়হা ফান' (অর্থাৎ-এ জগতের সব কিছুই নশ্বর)। আমরা খেলাফতে রাবেয়ার যুগে জামা'তী উন্নতির যেসব দৃশ্য অবলোকন করেছি তা কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। বিদায় গ্রহণকারীকে বিদায় জানানোর আর নতুনকে বরণ করার যে পদ্ধতি হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-আমাদেরকে বুঝিয়ে গেছেন তদনুযায়ী আমি আজ এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি চলুন আমরা ঘোষণা দেই, হে বিদায় গ্রহণকারী! মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মকে জগতে বিজয়ী করার লক্ষ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কর্মসূচীকে তুমি যে দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে গেছ আমরা চিরকাল এ কর্মসূচীকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে সব ধরনের কুরবানী অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় তুমি এ কাজের সমস্ত দাবী পূর্ণ করেছো। তোমার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার হাজার হাজার রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমীন।

...আমরা খোদা তাআলাকে হাজির নাজির জেনে অঙ্গীকার করছি, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শান্তি ও সৌহার্দের বাণী জগতের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য, গোটা বিশ্বকে তাঁর পতাকাতলে সমবেত করার লক্ষ্যে, একইভাবে আহমাদীয়া খেলাফতকে প্রতিষ্ঠি রাখতে আমরা সব ধরনের কুরবানী করতে সদা প্রস্তুত থাকবো। আর এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সব সময় দোয়ার মাধ্যমেও তোমাকে সাহায্য করতে থাকবো।

আপনারা দোয়া করুন, আল্লাহ্ তাঅলা চিরকাল তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের যে দৃশ্য এ জামা'তকে দেখিয়ে এসেছেন তা যেন এখন আগের চেয়েও বেশি দেখান।...তার রহমতের হাত যেন আমাদের মাথার উপর থেকে কখনও না সরে, কখনও না সরে, কখনও না সরে, (আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন)। (পাক্ষিক আহমদী)।

মহান খোদা তাআলা আমাদের সকলকে যুগ খলীফার সান্নিধ্যে থেকে এবং তাঁর পরিপূর্ণ আনুগত্যে জীবন পরিচালনার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ধর্মের নামে রুসুম-রেওয়াজ ও কদাচার

আমাতুন নূর এজাজ (মুন্নি)

ইসলাম আমাদের দিয়েছে সর্বোৎকৃষ্ট জীবন বিধান। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত ইবাদত। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে সর্বাঙ্গীন সুন্দর করার লক্ষ্যে ইসলাম আমাদের দিয়েছে সুষ্ঠু পথ-নির্দেশনা। ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে কিভাবে বান্দা আল্লাহ্ তাআলার সাথে তার সম্পর্ক নিবিড় হতে নিবিড়তর করতে পারে।

বিগত চৌদ্দশত বৎসরে প্রকৃত ইমলামী শিক্ষা আমল করে বহু মু'মিন ওলী আল্লাহ্, গাউস-কুতুব ও মনীষীতে পরিণত করেছেন। ইসলাম পৃথিবীতে এক নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু চৌদ্দশত বৎসর পরে সমস্ত মুসলিম জাহানকে তথা গোটা দুনিয়াকে নৈতিক অবক্ষয় গ্রাস করে ফেলেছে। মুসলমানরা ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক ফেরকার লোকই ইসলামের নামে অনেক রুসুম রেওয়াজের (অনুষ্ঠানের) প্রবর্তন করেছে। যা প্রকৃত ইসলামের সাথে এসব রুসুম-রেওয়াজের দূরতম সম্পর্কও নেই।

মিলাদ মাহফিল

এ উপমহাদেশে বহুল প্রচলিত একটি রুসুম হলো মিলাদ মাহফিল। মিলাদের নামে যা করা হয় তা আপত্তিজনক। ঢাকা শহরেই কোন কোন জায়গায় প্রায় সারা রাত ধরে অতি জোরে মাইকের সাহায্যে সমবেত কণ্ঠে উচ্চস্বরে মিলাদ পড়ানো হয়। এমন এলাকায় অনেক রুগ্ন মানুষ থাকতে পারে। যাদের ঘুমের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সমবেত কণ্ঠের উচ্চস্বরের ধরুন এদের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। বাসা বাড়িতে ছাত্র ছাত্রী থাকে, তাদের স্কুলের পড়া পড়তে হয়। মাইকের তীব্র আওয়াজে তারা তা করতে পারে না। এলাকায় অমুসলমানও থাকতে পারে। আমার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দরুন তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানো কি সমীচীন?

মিলাদ মাহফিল এমন ইকটি রুসুমে পরিণত হয়েছে যে, এমনকি যারা নামাযের ধারও ধারে না অথচ তার গৃহে কারো অসুখ বিসুখ হলে, কোন বিপদে পড়লে, বা বিশেষ কোন আনন্দের ব্যাপার ঘটলে মৌলবী সাহেবকে ডেকে মিলাদের ব্যবস্থা করেন। মিলাদ যেন আজ ধর্মের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বহু মুসলমান দেশেই মিলাদ মাহফিলের রেওয়াজ নেই কেবল মাত্র এ উপমহাদেশেই জোরালো।

যিক্‌র

যিকরের মাধ্যমেই বান্দা আল্লাহ্ তাআলার প্রকৃত প্রেমিকে পরিণত হয়। এতে করে বান্দার আধ্যাত্মিকতার ক্রম বিকাশ ঘটতে থাকে। নামাযই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র। বান্দা যখন রাতের গভীরে বা দিনের বেলায় নির্জনে নিভৃতে তার প্রভুর দরবারে সেজদাবনত হয়। মনের সমস্ত আকুতি মিনতি নিয়ে চোখের জলে প্রভুর দরবারে আবেদন জানায় তখন তিনি তার অতি

নিকটে এসে যান। তার ডাক শুনেন। তার হৃদয়কে পবিত্র করেন। তাতে আধ্যাত্মিক জ্যোতিতে পূর্ণ করে দেন। যিক্‌রের মাধ্যমে মানুষের মানস্যত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটতে থাকে। মানুষ আল্লাহ্‌র রঙে রঙীন হতে থাকে।

নামায ছাড়াও আরও যিক্‌র আছে। কিন্তু আজকাল যিক্‌রের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা করা হচ্ছে তাকে কিছুতেই ইসলামী শিক্ষার গন্ডীভুক্ত করা যায় না। আমাদের বাসার পাশেই কোন এক এলাকায় সারারাত ধরে মাইকের সাহায্যে বহু লোক সমবেত কণ্ঠে উচ্চস্বরে এক ধরনের বিশেষ উচ্চারণে "লা ইলাহা ইলল্লাহ্" যিক্‌র করতে থাকে। কিছুদিন পর পরই এ যিক্‌র চলতে থাকে মাইক বাজিয়ে। মিলাদ মাহফিলের অনুষ্ঠান যে সকল সমস্যার সৃষ্টি করে এ ধরনের যিক্‌র ঠিক সে ধরনের সমস্যারই সৃষ্টি করে। বিস্তারিত আলোচনা যাওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। পাড়া প্রতিবেশীর সমস্যা সৃষ্টি করে এ ধরনের যিক্‌রে কি আল্লাহ্ তাআলা সুন্তষ্ট হন? বিবেকবান মানুষের নিকট এ প্রশ্নটি রেখে এ আলোচনার এখানেই ইতি টানতে চাই।

শবে বরাত

এ উপমহাদেশে শবে বরাত খুব আড়ম্বরের সাথে উদযাপন করা হয়। বিষয়টি বিতর্কিত। শবে বরাত সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের কোন স্থানে আছে বলে আমার জানা নেই। আমি শুধু একটি বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। শবে বরাতের রাতে হাজার হাজার টাকার বাজি পুড়িয়ে বাজির বিকট আওয়াজে রোগীদের, বৃদ্ধদের, শিশুদের বিশেষ করে হৃদরোগীদের হৃদয় কাঁপুনী ধরিয়ে কোন্ ইসলামের সেবা করা হচ্ছে? এ ছাড়া এতে রয়েছে অর্থের অপচয়। অথচ ইসলামে বলা হয়েছে "অপচয়কারী শয়তানের ভাই"।

মাযার যিয়ারত

আমরা আমাদের বাবা-মা, দাদা-দাদী ও আপনজনদের মাযারে গিয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে দোয়া করি তাদের আত্মার মাগফেরাতের জন্য। আর তাদের নেক আমলগুলো যেন আমরা লাভ করতে পারি। আমরা পুণ্যাত্মা ও ওলী-আল্লাহ্‌গণের জন্য মাযারও যিয়ারত করি। উদ্দেশ্য একটাই। আমাদেরকেও যেন নেকীর অংশীদার করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল মাযার যিয়ারতের নামে কবর পূজা চলছে। কোন কোন মানুষ ওলী-আল্লাহ্‌গণের মাযারে টাকা দেয়। মোমবাতি জ্বালায়। কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত: মাযারে সেজদাও করে। এ যুগে এক ধরনের মাযার ব্যবসায়ীর সৃষ্টি হয়েছে। তারা জনগণের অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে রমরমা মাযার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এরা খাদেম নামে অভিহিত। প্রশ্ন হচ্ছে মৃত ব্যক্তির কাছে জীবিত মানুষের কি কিছু চাওয়া-পওয়ার আছে? মৃত মানুষ কিছুই দিতে পারে না। কারণ আল্লাহ্ তাআলার নিকট ফিরে গেছে। দুনিয়ার সাথে তারা সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

পা ছুয়ে সালাম বা কদমবুছি করা

অতি ভক্তিতে আমরা গুরুজনদেরকে ও সম্মানিত ব্যক্তিগণকে পা ছুয়ে সালাম করে থাকি। এটা এক ধরনের শির্‌ক। কারণ মু'মিন আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নিকট মাথা ঝুঁকাতে পারে না। কোন কোন পীরের আস্তানায় দেখা যায় মুরীদগণ অতি ভক্তিতে পীর সাহেবকে কেবল পাঁ ছুয়ে সালামই করে না; বরং একেবারে সেজদা করে ফেলে। এটাতো শির্‌কের নামান্তর। পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানব ও রসূল হলেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.), তাঁকে (সা.) কি কোন সাহাবী সেজদা করেছিলেন? বা পা ছুয়ে সালাম করেছিলেন? কুরআন-হাদীস বা ইতিহাস থেকে কি এর একটি প্রমাণও পাওয়া যাবে? তবে কি আমাদেরকে এ ধরনের শির্‌ক থেকে মুক্ত হওয়া উচিত নয়?

রোযার নামে বাড়াবাড়ি

রোযা ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি স্তম্ভ। মু'মিনের জন্য রোযা ফরয করা হয়েছে। রোযা আমাদেরকে সংযম শিক্ষা দেয়, আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে। হজ্জ যেমন- শর্তসাপেক্ষে, রোযাও তেমনি শর্তসাপেক্ষে। সূরা বাকারায় সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে, তোমরা সফরে থাকলে ও পীড়িত অবস্থায় রোযা করো না। পড়ে অবশ্য এ রোযা পুরণ করে দিতে হয়। এমন বৃদ্ধ আছেন বা পীড়ত লোক আছেন, যাদেরকে চিকিৎসকগণ রোযা রাখতে নিষেধ করেন। তাদের জন্য ফিদিয়া দেয়া যথেষ্ট। কিন্তু গ্রামে-গঞ্জে দেখা যায় অনেকেই অসুখ অবস্থায়ও রোযা রাখেন। এমন কথাও কাউকে বলতে শুনা যায়, অসুখে মরে যাব তবুও রোযা ভাঙ্গব না। রোযা মুখে নিয়ে মরবো। খোদার সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে এ ধরণের লোকেরা খোদাকে জোর করে সন্তুষ্ট করতে চায়। এসব কিছুরই মূলে রয়েছে অজ্ঞতা। ইসলাম যে শিক্ষা আমাদেরকে দিয়েছেন তা-ই পালন করা আমাদের কর্তব্য এর বেশি নয়।

হিলাহ্

রাগের মাথায় কেউ কেউ স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে থাকে। অত:পর ফতোয়াবাজরা অসহায় ও অনুতপ্ত স্বামীকে হিলাহ্ বিয়ের পরামর্শ দিয়ে থাকে। হিলাহ্‌র অর্থ হলো স্বামীর সাথে দ্বিতীয়বার বিয়ের আগে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে-সংসারের ব্যবস্থা করতে হয়। এ ধরণের কোন বিধি-বিধান ইসলামে নেই। অথচ রাগের মাথায় এক সঙ্গে তিন তালাক দেয়ার কোন ব্যবস্থা ইসলামে নেই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, এই সকল করা হচ্ছে ইসলামের নামে। তবে এটা আশা ব্যঞ্জক যে, ধীরে ধীরে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এ ব্যাপারে অনেকখানি সচেতন হয়ে উঠেছে।

খাত্‌না ও আকিকা

স্বাস্থ্যসম্মত কারণে শৈশবে ছেলেদের খাতনা করা হয়। এটি একটি ইসলামী বিধান এবং সুন্নত। কিন্তু খাত্‌নাকে কেন্দ্র করে আজ অনেক রুসুম রেওয়াজ জন্ম হয়েছে। অনেক ধনী ব্যক্তির ছেলের খাত্‌না উপলক্ষ্যে এত বেশী আনন্দ উৎসব ও ভোজের আয়োজন করে থাকে, যা অর্থের অপচয় ও মিথ্যা আড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়। অনুরূপভাবে অনেকেই বিপুল আড়ম্বর জাঁক-জমক ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করে সন্তানের আকিকা করে থাকেন। আকীকা ধর্মীয় বিধান। কিন্তু অর্থহীন আড়ম্বর ও অর্থের অপচয় নিশ্চয় ধর্মীয় বিধান নয়।

কুলখানি ও চেহলাম

আমাদের দেশে ম মৃত্যুর চতুর্থ দিনে কুলখানি ও ৪০তম দিনে চেহলামের আয়োজন করে থাকেন। গরীব-মিসকীনকে খাওয়ানো নিশ্চয় উত্তম কাজ। কিন্তু মৃত্যুর চতুর্থ দিনে ও ৪০তম দিনে কুলখানি ও চেহলাম এর ন্যায় অনুষ্ঠানের আয়োজন ইসলাম সম্মত কিনা অথচ কুরআন হাদীসে এ সম্পর্কে কোন দিকনির্দেশনা আছে কিনা তা আমার জানা নেই। এসব অনুষ্ঠান নি:সন্দেহে কুস্কার। ইসলাম যা শিক্ষা দিয়ে তা পালন করার মধ্যেই কল্যাণ নিহীত। মহান আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে এসব রুসুম রেওয়াজ থেকে রক্ষা করুন, আমীন।

পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে-

জ্বালাও-পোড়াও সন্ত্রাসী কাজ ইসলামের নয়

ভোরের কাগজ
ঢাকা বুধবার ২৫ বৈশাখ ১৪২০ ● ৮ মে ২০১৩

মাহমুদ আহমদ সুমন

জ্বালানো-পোড়ানো এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। যারা ধর্মের নামে এসব গর্হিত কাজে লিপ্ত তারা কখনো শান্তির ধর্ম ইসলামের অনুসারী হতে পারে না। তথাকথিত হেফাজতে ইসলাম যে আসলেই সন্ত্রাসী জামাত-শিবিরেরই আরেক রূপ তা দেশবাসীর কাছে তারা নিজেরাই স্পষ্ট করেছেন। তারা যে কতো ভয়াবহ তাণ্ডব চালাতে পারে তাও সকলে গত রোববার প্রত্যক্ষ করেছে। বিক্ষুব্ধ হেফাজত কর্মীরা এ সময় বেপরোয়া গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগে মেতে ওঠে। এরা পল্টনে ট্রাফিক পুলিশের উপ-কমিশনার দক্ষিণের কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। এ সময় তারা সেখানে দায়িত্বরত চার পুলিশ সদস্যের কাছে থাকা শটগান ও চাইনিজ রাইফেল ছিনিয়ে নেয়। বায়তুল মোকাররম ও বিজয়নগর এলাকায় ফুটপাতে থাকা বিভিন্ন দোকানে আগুন ধরিয়ে দেয় তারা। আগুন ধরিয়ে দেয় পল্টনে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন ভবন, বাম রাজনৈতিক দলের কার্যালয় মুক্তি ভবন, র‍্যাংগস ভবনের নিচতলায় একটি ফাস্টফুডের দোকান ছাড়াও বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ গেটের ফুটপাতে থাকা শতাধিক দোকানে। এসব দোকানের মধ্যে পবিত্র কুরআন, হাদিস, ধর্মীয় বই, জায়নামাজ ও তসবিহর দোকানও রয়েছে। সন্ধ্যার পর বিক্ষোভকারীরা হাউস বিল্ডিংয়ের সামনে একটি ট্রান্সফরমারে আগুন ধরিয়ে দিলে বিকট শব্দে তা বিস্ফারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হেফাজত কর্মীদের দেয়া আগুনে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের নিচতলায় থাকা অর্ধ শতাধিক গাড়ি এ সময় ভস্মীভূত হয়। একটু ভেবে দেখুন, এরা নাকি ইসলামের হেফাজতকারী?

যাদের হাত থেকে পবিত্র কুরআন পর্যন্ত রক্ষা পায়নি, যাদের কাছে কুরআনের কোনো মূল্য নেই তারা আবার কিভাবে ইসলামের কথা মুখে উচ্চারণ করে? এরা নিঃসন্দেহে ধর্মীয় সন্ত্রাসী, এরা কখনো মুসলমান হতে পারে না। এ ধরনের সন্ত্রাসীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে বেগম জিয়া কী এটা প্রমাণ করলেন না যে, এরাই এসব ধর্মীয় সন্ত্রাসীদের মূল হোতা। তথাকথিত হেফাজতিরা পবিত্র কুরআনের অবমূল্যায়ন করে সমগ্র মুসলমানের হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। সরকারের উচিত হবে যারা এ ধরনের অপকর্মের সঙ্গে জড়িত এবং যাদের উস্কানিমূলক বক্তব্যের কারণে এই হীন কাজটি তারা করেছে তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা।

ইসলাম ধর্মের কোনো ক্ষতি করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। যেভাবে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর আমি ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করলাম' (সুরা মায়েদা : ৩)। পবিত্র কুরআনের ব্যাপারেও আল্লাহতায়ালার ঘোষণা হলো 'নিশ্চয় আমি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয় আমিই এর সুরক্ষাকারী' (সুরা হিজর:৯)। এই আয়াতে কুরআন করিমকে অবিকলরূপে সংরক্ষণ করার যে প্রতিশ্রুতি আছে তা এমন সুস্পষ্টরূপে পূর্ণতা লাভ করেছে যে, অন্য কোনো প্রমাণ যদি নাও থাকতো তবু এই সত্যই কুরআনের এলাহী উৎস প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতো। এই সুরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল এমন এক সময়ে যখন মহানবী (সাঃ) এবং তার সাহাবাগণের (রাঃ) জীবন চরম বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে ছিল এবং শত্রুপক্ষ নতুন ধর্মমতকে সহজেই নিষ্পেষণ করে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো। এরূপ এক অবস্থার মধ্যে কাফেরদের তাদের চরম অপচেষ্টা দ্বারা একে ধ্বংস করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান জানানো হয়েছিল এবং এই সঙ্গে তাদের সাবধানও করে দেয়া হয়েছিল যে তাদের সকল ষড়যন্ত্র আল্লাহতায়ালা ব্যর্থ করে দেবেন। কারণ তিনি আল্লাহ স্বয়ং এর হেফাজতকারী। এই দাবি ছিল দ্ব্যর্থহীন ও খোলাখুলি এবং শত্রুপক্ষ ছিল শক্তিশালী ও নির্মম। তথাপি কুরআন যাবতীয় বিকৃতি, প্রক্ষেপ ও হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিরাপদ থেকে অব্যাহতভাবে স্বীয় নিরাপত্তার বিজয় ঘোষণা করে চলেছে। আল্লাহতায়ালা মহানবীকে (সাঃ) কুরআন শরিফের সুরক্ষার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা এক স্থায়ী প্রতিশ্রুতি। পবিত্র কুরআনের এসব আয়াত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম ও কুরআনের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং নিয়েছেন আর এর হেফাজতও তিনি সঠিকভাবেই করছেন। ইসলাম সম্পর্কে যার সামান্যতম জ্ঞান আছে সেও তো চাইবে না যে কাজ আল্লাহর জন্য নির্ধারিত সেই কাজে হাত দেয়। তাহলে কিভাবে তারা হেফাজতে ইসলাম নামে একটি সংগঠন করে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন? এরা এই কাজ করে ইসলাম ও রসুলের অবমাননা কি করছেন না?

এদেশে অগণিত ধর্মভিত্তিক জঙ্গি দল রয়েছে। যদি খতিয়ে দেখা হয় তাহলে দেখা যাবে এসব দলের মূল একটাই আর তাহলো জামাতে ইসলামী। এরাই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে মাঠে নেমে ইসলামের কথা বলে সহজ-সরল লোকদের ধোঁকা দেয় আর জঙ্গি কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই ধর্মান্ধ দুর্ভাগারা ইসলাম ও রসুল (সাঃ) অবমাননার সচিত্র উদাহরণ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপিয়ে ব্যাপকভাবে প্রচার করছে। গোপনে কিছু হতভাগা নোংরা ভাষা ব্যবহার করেছিল তাও জনসমক্ষে এই মৌলবাদীরা তুলে ধরছে এবং পুনরাবৃত্তি করছে অবলীলায়। ব্লগার রাজীব হত্যার পরপরই তার সম্পর্কে যে তথ্য ছড়ানো হয়েছিল তাতে উল্লেখ করা হয়েছে এই ধৃষ্টতা আজকের নয়, ২০১০ সালের জুলাই মাসের। প্রশ্ন হলো, বছরের পর বছর এসব অপবাদ-অভিযোগ যথাযথভাবে খণ্ডন না করে তারা এগুলোকে আগলে রেখেছিল কেন? ঝোপ বুঝে কোপ মারার জন্য, তাই না? 'আল্লামা' হিসেবে কি এসব কটূক্তির যৌক্তিক ও অকাট্য জবাব দেয়া হেফজত নেতাদের দায়িত্ব ছিল না? সমাজের ক'জনই বা এই অবমাননা সম্পর্কে জানতো? আর আজ আপনারা হেফাজতিরা সেই অপমানটারই প্রচার সম্পূর্ণ করে দিলেন! অতএব আপনারাও আজ সমানভাবে রসুল (সাঃ) অবমাননাকারী! তারা যদি হয় নির্বোধ অপরাধী, আপনারা হলেন জ্ঞান-পাপী। আড়াই বছর ধরে রসুল (সাঃ) অবমাননা সহ্য হয়, কিন্তু গণহত্যাকারী যুদ্ধাপরাধীদের যথাযথ বিচারের দাবি সহ্য হয় না আপনাদের। এখন নিজেদের বাঁচানোর জন্য আন্দোলনের মোড় ভিন্ন খাতে নেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলন করছে তাদের আপনারা সহ্য করতে পারছেন না। আপনারা যদি প্রকৃত ইসলামেরই অনুসারী হতেন তাহলে তো এই দাবির সঙ্গে আপনাদেরও ঐকমত্য থাকার কথা ছিল। কেননা নিরীহ নিরপরাধ মানুষ হত্যার বদলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান চাওয়া কি ইসলাম বিরোধী? ইসলামে তো 'কিসাস' বলতে কিছু আছে। তাহলে কেন আপনারা ইসলামের হেফাজতের কথা বলে ইসলাম বিরোধী কাজ করছেন? ধর্ম-ব্যবসায়ীদের মুখোশ খসে পড়ার এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে হঠাৎ করেই আপনাদের ইসলাম হেফাজতের দায়িত্বের কথা মনে পড়লো?

কারা খোদাদ্রোহী? যারা শান্তিপূর্ণভাবে বৈধ দাবি জানিয়ে আন্দোলন করে তারা, নাকি যারা ইসলামের শিক্ষার বিপক্ষে কাজ করে তারা? বিশ্বনবী হজরত মুহাম্মদকে (সাঃ) কাফেররা কতোই না অত্যাচার করেছে, কতোই না গালিগালাজ করেছে এর উত্তরে কি তিনি কখনো রাগান্বিত হয়ে কিছু করেছেন? যদি আজকে কেউ ইসলামের অবমাননা করে থাকে তাকে সুন্দরভাবে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ সম্পর্কে বুঝানো উচিত। তাকে না বুঝিয়ে তার মাথায় আঘাত করে তাকে হত্যা করে ফেলার নামতো ইসলাম নয়। কেউ যদি ইসলামের বদনাম করে তাহলে ইসলামের শিক্ষা হলো ধৈর্য ধারণ করা এবং উত্তমভাবে এসব কথাকে পরিহার করে চলা।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ হজরত মুহাম্মদকে (সাঃ) উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'কাফেররা যা বলে, তজ্জন্যে আপনি সবুর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদের পরিহার করে চলুন' (সুরা মুজাম্মেল: ১০)। এখানে আল্লাহ কি এটা বলতে পারতেন না যে, যারা আপনাকে অপমান করে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। কিন্তু কী বলা হয়েছে, বলা হয়েছে সবুর করুন আর সুন্দরভাবে তাদের পরিহার করুন। কাফেররা সব সময়ই হজরত রসুল করিমকে (সাঃ) কষ্ট দিতেন এবং অবমাননাকর কথাবার্তা বলতেন। কিন্তু কখনই তিনি রুষ্ট হতেন না। হজরত রসুলপাক (সাঃ) অবিশ্বাসীদের বিদ্রূপের কারণে কখনই ব্যথিত ছিলেন না বরং তিনি ব্যথিত থাকতেন একটি কারণে আর তা ছিল আল্লাহর সঙ্গে অন্যান্য দেব-দেবীর শরিক করার কারণে। তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে এই প্রার্থনাই করতেন হে আল্লাহ তুমি এদেরকে ক্ষমা করো কারণ এরা বুঝে না। আজকে যারা হেফাজতে ইসলামের নামে বা অন্যান্য নামে ইসলাম রক্ষার কাজে রত তারা কি বুকে হাত দিয়ে এই কথা বলতে পারবেন যারা ইসলামের অবমাননা করছে বলে আপনারা ধারণা করেন তাদের সংশোধনের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কামনা করেছেন? হাদিসে পাওয়া যায় কারো দোষ দেখলে তার জন্য কমপক্ষে চল্লিশ দিন দোয়া করা উচিত এটা কি আপনারা কেউ করেছেন? আপনারা যদি ইসলামের অনুসারী হয়েই থাকেন তাহলে ইসলামী পন্থায় আপনাদের আন্দোলন হবে আর সেই আন্দোলন মিছিল-মিটিং আর জ্বালাও-পোড়াওয়ের মাধ্যমে বরং নয় দোয়ার মাধ্যমে। যেহেতু তথাকথিত হেফাজতের আসল চেহারা স্পষ্ট হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, তাই হেফাজতিদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে এবং ধর্মের নামে তাদের এসব ভণ্ডামি রোধে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপও নিতে হবে।

মাহমুদ আহমদ সুমন : লেখক।
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

৭ম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন, ২০১৩ অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার মুসীদের অংশগ্রহণে গত ২৭ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখ রোজ শনিবার সকাল ৯-৩০ মিনিট হতে বিকাল ৪-৩০ মিনিট পর্যন্ত ৭ম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন, ২০১৩ দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার আমীর, জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই সম্মেলন শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। অত:পর কেন্দ্রীয় কর্মসূচী মোতাবেক উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ওসীয়্যতের গুরুত্ব এবং ওসীয়্যতকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করত: আল ওসীয়্যত পুস্তকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ওসীয়্যতকারীদের যে সকল বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন, তা উল্লেখ করে সে মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালিত করার বিষয়ে নসিহত করেন। উদ্বোধনী ভাষণের পর তিনি দোয়া পরিচালনা করেন।

অত:পর উপস্থিত মুসীদেরকে এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য মোবারকবাদ জানিয়ে ওসীয়্যতকারীকে প্রকৃত মুত্তাকী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর নির্দেশনা মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য এবং খুলনা জামা'তে ওসীয়্যত বিভাগের এক বছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর রিপোর্ট পেশ করেন সেক্রেটারী ওয়সীয়্যত জনাব মোহাম্মদ জিয়াদ আলী। এরপর মুসীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের উপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মুবাশ্বের মুরব্বী মওলানা খুরশিদ আলম।

দ্বিতীয় পর্বে সভাপতি আল ওসীয়্যত পুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত বিধি বিধানের আলোকে উপস্থিত মুসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। পরিশেষে সম্মেলনে অংশগ্রহণের অনুভূতি ব্যক্ত করে লাজনাদের মধ্য হতে বক্তব্য রাখেন জোহুরা তাজনীন ও দীনা নাসরিন। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনে খুলনা জামা'তের বর্তমান ৩৯ জন ওসীয়্যতকারীর মধ্যে ৩১ জনসহ মোট ৩৮ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে তিনজন লাজনা বোন নেযামে ওসীয়্যতে শামীল হওয়ার জন্য ওসীয়্যতের আবেদন ফরম পূরণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

মোহাম্মদ জিয়াদ আলী

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আহমদনগরের প্রবীন আহমদী মরহুম মৌলভী আবু ঈসা সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব ফরিদ আহমদ গত ২৫/০৪/২০১৩ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৭ ঘটিকায় নিজ বাড়ীতে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। মরহুম স্ত্রী, ৪ ছেলে, ২ কন্যা এবং নাতি-নাতনীসহ বহু শুভাকাঙ্খী রেখে গেছেন। মরহুমকে আহমদনগর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে। মহান খোদা তাআলা যেন মরহুমকে মাগফেরাত ও জান্নাতবাসী করেন এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সাবরে জামিল দান করেন এইজন্য জামা'তের সকলের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করছি।

মরহুমের বড় কন্যা
সিদ্দিকা বেগম, আহমদনগর

চান্দপুর চা বাগান

গত ০৫/০৪/২০১৩ চান্দপুর চা বাগান মজলিসের উদ্যোগে বাদ জুমুআ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, প্রেসিডেন্ট। কুরআন তেলাওয়াত করেন কামরুল হাসান চৌধুরী (ইমন), নযম পাঠ করেন সারোয়ার হোসেন চৌধুরী (রাসেল)। তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবন আদর্শ নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন সর্বজনাব দেলোয়ার হোসেন চৌধুরী, কামরুল হাসান চৌধুরী, আব্দুর রহীম, তাহেরা বেগম চৌধুরী এবং রানু বেগম চৌধুরী। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

কামরুল হাসান চৌধুরী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ

গত ০৫/০৪/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস সফলতার সহিত পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মাসুদা পারভেজ-এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আফরিন আহমদ। নযম আবৃত্তি করেন তাহমিনা ফয়েজ মিতু ও খাওলাদ্বীন উপমা। অত:পর বক্তৃতা পর্বে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর রসূল প্রেমসহ বিভিন্ন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন-জুয়েল বেগম দিবা, মরিয়ম বেগম কবিতা, দিলরুবা বেগম মায়া এবং ডা: শিমুল আহমদ। শেষে সভানেত্রীর ভাষণ এবং ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে উক্ত দিবসের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হয়। এতে ৪৯ জন উপস্থিত ছিলেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা

গত ১২/০৪/২০১৩ রোজ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবস পালন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভানেত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্, খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন শামিমা ইয়াসমীন। হাদীস পাঠ করেন শাহিনা মোস্তাক। দোয়া ও আহাদ পাঠ করান স্থানীয় লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট। নযম পাঠ করেন জাতিন মোবারক (ঐশী)। উক্ত অনুষ্ঠানে ইসলাম প্রচারে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়। আলোচনা পর্বে অংশনেন তাহেরা তাজনীন, আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, রেহেনা জাফর এবং দীনা নাসরিন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে ৪১ জন উপস্থিত ছিলেন।

রোকসানা মঞ্জুর ডলি

দোয়ার আবেদন

আমার ছেলে আবরার মাসুদ সিরাজী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের সদস্য, সে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি পরীক্ষায় **নাসিরাবাদ সরকারী বালক উচ্চ বিদ্যালয়,** চট্টগ্রাম হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে GPA-5.00 লাভ করেছে।

আলহামদুলিল্লাহ। উল্লেখ্য যে, সে চট্টগ্রামের মরহুম মাসুদুল হক সাহেবের ছেলের ঘরের নাতী এবং দিনাজপুর নিবাসী মরহুম সানাউল্লাহ সাহেবের মেয়ের ঘরের নাতী।

আল্লাহ্ তাআলা যেন তার নেক ইচ্ছা পূরন এবং তাকে খোদাভীরুতা, দয়া ও রহমতের চাদরে আবৃত্ত রাখেন সেজন্য জামা'তের সকল ভাই-বোনদের নিকট দোয়া প্রার্থী।

খালিদ আহমদ সিরাজী
পূর্ব নাছিরাবাদ, চট্টগ্রাম

কৃতী ছাত্রী

আমাদের একমাত্র কন্যা সাদিয়া আহমদ শ্রাবনী, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চরসিন্দুরের সদস্যা, সে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি পরীক্ষায় ***তৌহিদ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়*** হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে GPA-5.00 লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ। ভবিষ্যতে যেন আল্লাহ্ তাআলা তাকে আরো ভালো রেজাল্ট করার সৌভাগ্য দান করেন সেজন্য জামা'তের সকলের নিকট দোয়া কামনা করছি।

আলী আহমদ ও কামরুন্নেসা বেগম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চরসিন্দুর

আমাদের দ্বিতীয় কন্যা ডলি আহমদ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চরসিন্দুরের সদস্যা, সে ২০১৩ সালে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি পরীক্ষায় ***তৌহিদ মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়*** হতে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে GPA-5.00 লাভ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ। ভবিষ্যতে যেন আল্লাহ্ তাআলা তাকে আরো ভালো রেজাল্ট করার সৌভাগ্য দান করেন সেজন্য জামা'তের সকলের নিকট দোয়া কামনা করছি।

এজাজ আহমদ ও কানেতা বেগম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, চরসিন্দুর

আমাদের বড় মেয়ে ফারিয়া রহমান ঐশ্বর্য রানীগঞ্জ আদর্শ-প্রি-ক্যাডেট স্কুল ঘোড়াঘাট দিনাজপুর হতে ২০১২ সালের ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় কিন্ডার গাডেন্ট এসোসিয়েশন হতে টেলেন্ডপুলে এবং সরকারী পরীক্ষায় সাধারন গ্রেডে বৃত্তি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সে যেন উচ্চ শিক্ষা লাভ করে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নতি করতে পারে সে জন্য জামা'তের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট দোয়া প্রার্থী।

মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ও তারেকা বেগম
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ভাতগাঁও

শুভ বিবাহ

* গত ০৮/১১/২০১২ মোসাম্মৎ তাসলিমা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান হাটুলিয়া, ময়মনসিংহ-এর সাথে মোহাম্মদ কবির আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, তেরগাতী, কিশোরগঞ্জ-এর বিবাহ ১,০০,০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।॥

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৪৫/১২

* গত ২৯/১০/২০১২ বিথী আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ রেজাউল হক, মাজদিয়া-এর সাথে মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান, পিতা-মোহাম্মদ ছবিব উদ্দিন, মাজদিয়ার-এর বিবাহ ৬০,০০১/- (ষাট হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৪৬/১২

* গত ২৩/১১/২০১২ আসমাউল হুসনা (টুম্পা), পিতা-মোহাম্মদ নুর নবী, গ্রাম কাঁশাহার, বগুড়া-এর সাথে লুৎফর রহমান তাহের, পিতা-মওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, ৪নং বকশীবাজার, রোড ঢাকা-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (একলক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৪৭/১২

* গত ০৭/১২/২০১২ ফারহানা ইয়াসমিন, পিতা-জহির উদ্দিন, মহব্বতপুর, দিনাজপুর-এর সাথে আলমগীর ইসলাম, পিতা-রফিকুল ইসলাম, হেলেঞ্চাকুড়ি, দিনাজপুর-এর বিবাহ ২,২৯,৯৯৯/- (দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার নয়শত নিরানব্বই) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৪৮/১২

* গত ১২/১২/২০১২ নূর নাহার নূরী, পিতা-এ, কে, এম, নূর ইসলাম, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর-এর সাথে গোলাম আজম, পিতা-আব্দুল করীম, মৌলভীবাজার, সিলেট এর বিবাহ ১৪,০০,০০০/- (চৌদ্দ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৪৯/১২

* গত ১২/২০/২০১২ নয়ন আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ শাহজাহান, গ্রাম তুলাগাঁও, কুমিল্লা'র সাথে বশির আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ সাইদুল হক, ১২৪৩ রৌফাবাদ কলোনী, চট্টগ্রাম-এর বিবাহ ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৫০/১২

* গত ১২/১২/২০১২ ছন্দা বেগম, পিতা-সাব্বির আহমদ, তারুয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র সাথে এ্যাডভোকেট মোহাম্মদ এহসান হাবিব, পিতা-মৃত: আব্দুল ওহাব, ১০০৪ পূর্ব মেড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া'র বিবাহ ৬০০,০০১/- (ছয়লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৫১/১২

* গত ০৫/১১/২০১২ লিমা পারভীন, পিতা-মোহাম্মদ মোজাম্মেল গাজি, যতীন্দ্রনগর, সাতক্ষীরা'র সাথে লালন গাইন, পিতা-ছাকাত গাইন, মিরগাং সাতক্ষীরা'র বিবাহ ৪০,০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৫২/১২

* গত ০৮/০১/২০১৩ আসমা সুলতানা, পিতা-মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, ছোট কুপট, সাতক্ষীরা'র সাথে মোহাম্মদ আব্দুল হাফিজ নাসিরুজ্জামান, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ সরদার, সাতক্ষীরা'র বিবাহ ১০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৫৩/১২

* গত ২৮/১২/২০১২ সামিয়া আক্তার, পিতা-তোফাজ্জেল হোসেন, ৩৯২নং আজমপুর মধ্যপাড়া, দেওয়ান বাড়ি রোড, লেন-২, দক্ষিণখান, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০-এর সাথে কে, এম আবু হানী, পিতা-খান আলিউজ্জামান, কলাতলা, চিতলমারী, বাগেরহাট-এর বিবাহ ৫০০,০০১/- (পাঁচ লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৫৪/১৩

* গত ০৬/০২/২০১৩ কিশোয়ার হাসিন দিশা, পিতা-জাফর আহমদ, ইস্ট কাফরুল, ঢাকা'র সাথে মোহাম্মদ সরওয়ার, পিতা-মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, লন্ডন, ইউ, কে-এর বিবাহ (£১০,০০০/- পাউন্ড) মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৫৫/১৩

* গত ২১/০১/২০১৩ মোর্সেদা আক্তার (মামুনি), মোহাম্মদ মোবাশ্বের আলী, রামপুর, কাহারুল, দিনাজপুর-এর সাথে মোহাম্মদ মোস্তাকিন আলী, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার, হেলেঞ্চাকুড়ি, ১০ মাইল-এর বিবাহ ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৫৬/১৩

* গত ০১/০২/২০১৩ দিল আফরোজ (টপি), পিতা-দেলোয়ার হোসেন আকন্দ (দোলা), নিউসোনাতলা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া'র সাথে পায়েল আহমদ পলাশ, পিতা-হাবিবুর রহমান আকন্দ, নিউসোনাতলা'র বিবাহ ১০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৫৭/১৩

* গত ১৪/১২/২০১২ মোসাম্মৎ সেলিনা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ আবদুল কাদের, তাজহাট, রংপুর-এর সাথে আবুল কাশেম ভূঁইয়া, পিতা মৃত:- গোলাম হোসেন ভূঁইয়া, গালিমগাজি, আমীরগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ-এর বিবাহ ১০০,০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-১০৫৮/১৩

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষীকি জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।